শ্যামলীদি

কিছু পাঠ

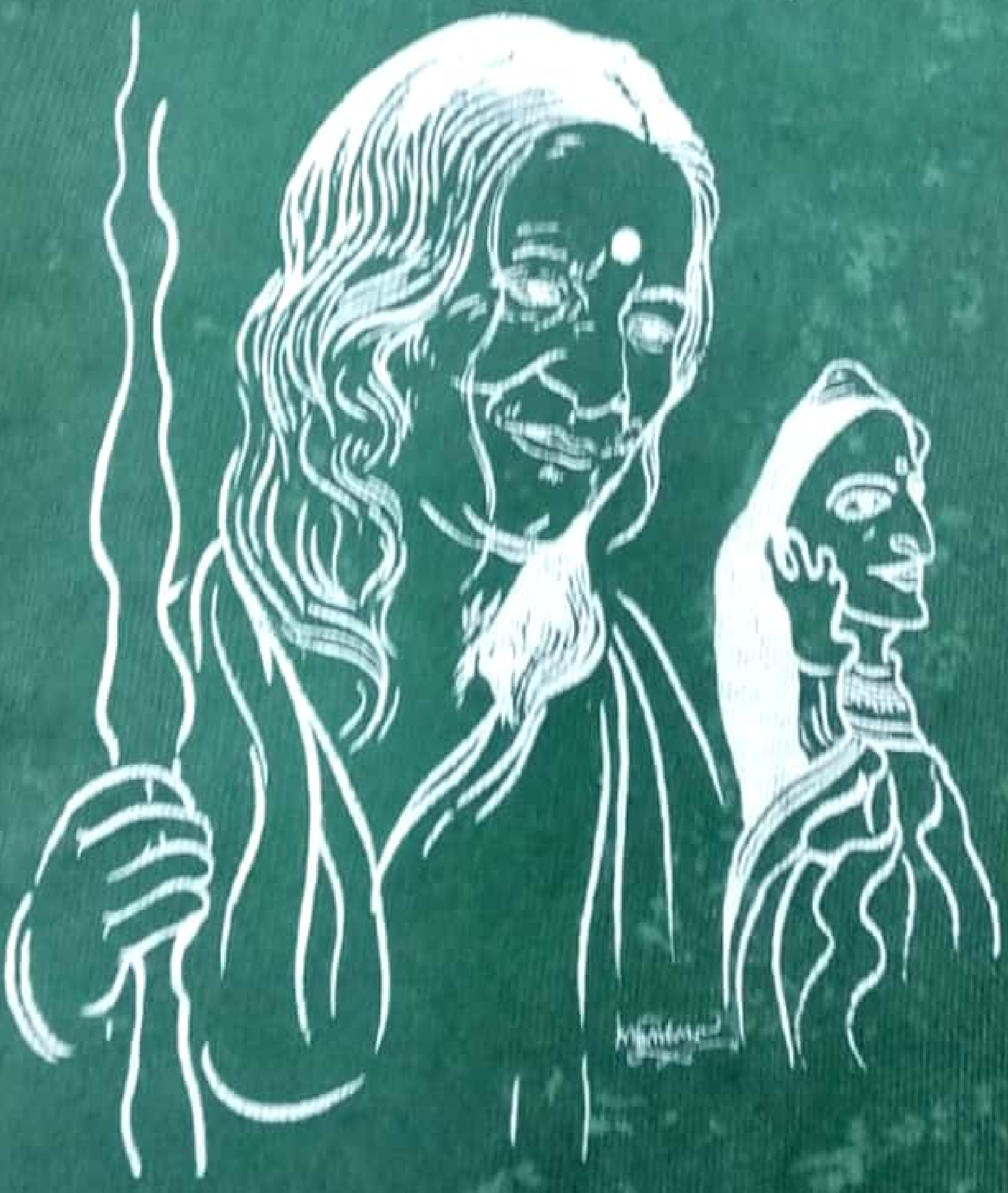

Scanned by CamScanner

শ্যামলীদির এক অসাধারণ চালচিত্র

('প্রতিদিন-রোববার'- এ নবনীতা দেব সেন-এর লেখা 'ভালোবাসার বারান্দা' থেকে।)

আমাদের শ্যামলী ছিল জগতের আনন্দযজ্ঞে শর্ট লিস্টেড গেস্ট।

ভালোবাসা দিতেও সে যেমন দড়, ভালোবাসা পেতেও তেমনি। এত ভালোবাসা ছিল ওর মধ্যে, এত টান এত মায়া। মায়া সারা জীবজগতের প্রতি। সৃষ্টির প্রতিটি কণা ছিল তার কাছে মূল্যবান। ধরিত্রীকে সুস্থ রাখা, তাকে অকলঙ্ক রাখা, তাকে দীর্ঘায়ু রাখা সে তার নিজের দায়িত্ব বলে ধরে নিয়েছিল। সেই একই মানসিকতার মানুষদের সঙ্গে তার বন্ধুতা হত, কাজের সঙ্গী হয়ে পড়ত সে তাদের, বয়েস যার যা-ই হোক না কেন। তিনি স্বাধীনতাসংগ্রামী বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্তও হতে পারেন, আবার গ্রামের কোনও নাম না-জানা সাঁওতালনীও হতে পারেন। শ্যামলী আদর করতে ভালবাসত, নিজে সে যতই অসুস্থ থাকুক, সেই অবস্থাতেও কেউ তার বাড়ি থেকে কিছু না খেয়ে শুধুমুখে বেরোতে পারত না। সে সত্যিকারের মুক্তপ্রাণী ছিল, কিন্তু বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি তার জন্যে ছিল না। বাগানের গাছপালাগুলোও তার আদর পেত। আর বিশ্বসুদ্ধ মানুষের কল্যাণের জন্য এই বিশ্বের বসবাসকারী হিসেবে সে নিজেকে যেন ব্যক্তিগত ভাবে দায়বদ্ধ মনে করত। তার বাবা শিল্পী সুধীর খাস্তগীর ছিলেন ঘোরতর শান্তিবাদী, যুদ্ধবিরোধী। তাঁর মনোভাব থেকেই হয়তো শ্যামলী শিখেছিল মানুষ খুনের অস্ত্র জোগান দেওয়া ব্যবসার বিরোধী হতে। মাতৃহীন শ্যামলী তার বাবার কাছে শুধু ছবি আঁকতেই শেখেনি, শিখেছিল তাঁর মানবিক মূল্যবোধগুলোও। তার জীবনের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কটিও সে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে ছেলেকে নিয়ে দেশে ফিরে এসেছিল, শুধুমাত্র স্বামীর কর্মস্থল, যুদ্ধাস্ত্র তৈরির কারখানায়, উচ্চপদে কাজ করার নৈতিকতা নিয়ে আদর্শগত বিরোধের জন্য। এমন ঘটনা আমাদের প্রজন্মে আমি আর দেখিনি। শ্যামলী ছিল সত্যি অর্থে শান্তির সাধক। ('শান্তির সৈনিক' কথাটা কী বিচ্ছিরি, না?) সেই সাধনার জন্যে অনেকখানি ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিল সে, কেননা জগতের শান্তি, আর মানুষের কল্যাণ ছিল তার সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে প্রার্থনার বস্তু।

শ্যামলী ফিরে এসে সব গল্প শোনাত। ওরও ঠিক আমারই মতো সুস্বাস্থ্য, এদিকে হাঁপানি, ওদিকে পায়ের ব্যথা। তাই নিয়ে বাসে, ট্রেনে, পায়ে হেঁটে ঘুরছে সারা ভারতের চেনা-অচেনা গ্রামে গঞ্জে, সমাজের দৈন্য, মানুষের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করতে। আর তা অপসারণের জন্যে এক তিলও যদি কাজ করতে পারা যায়? কোথায় কোথায় না গিয়েছে

Scanned by CamScanner

সে মেয়ে? এলোপাথাড়ি মনে পড়ে, সে গিয়েছিল পোখরানে। গিয়েছিল জাদুগোড়ায়, ছবি তুলে এনেছিল সেখানকার গ্রামের মানুষের, কীভাবে পারমাণবিক দূষণে তাদের স্বাস্থ্য বিপন্ন, জল বিষাক্ত, শিশুরা পর্যন্ত বিকৃত হয়ে জন্মাচ্ছে। তারপরেই আবার এল হরিপুরের সম্ভাবনার যন্ত্রণা। হরিপুর নিয়েও লড়াই করেছে সে। এখনও তো আমাদের সামনে দুঃস্বপ্ন রয়েছে হরিপুর পারমাণবিক কেন্দ্র তৈরির। আমেরিকাতে থাকার সময়ে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের বিপক্ষে শ্যামলী বারবার প্রতিবাদ করেছে, বারবার গ্রেপ্তার হয়েছে, একবার সেই 'ট্রাইডেন্ট' তৈরির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে সিয়াট্‌লে গ্রেপ্তার হয়েছিল, আর একবার হল ওয়াশিংটন ডিসি-তে হোয়াইট হাউসের সামনে। দেশ-বিদেশ বলে তো তার মনেপ্রাণে কিছু ছিল না, তার কারবার সারা বিশ্ব নিয়ে। তাই তার আবহাওয়া, তার প্রাণী, তার উদ্ভিদ, সবই জরুরি শ্যামলীর কাছে। তাই সে পান্নালাল দাশগুপ্তের সঙ্গে 'মীন মঙ্গলে' যায় উৎসব করে নদীতে মাছের পোনা ছাড়তে, গ্রামে পুকুর কেটে সেই মাটি জড়ো করে 'পাহাড়' বানাতে যায় সগৌরবে। দেশের যেখানে যে কোনো সেবার কাজ চলে, শ্যামলীর হাত নিঃশব্দে সেইখানে পৌঁছে যায়। সে 'নর্মদা বাঁচাও'- তে মেধা পটকরের কাছেই হোক, আর কুষ্ঠসেবায় বাবা আমটের 'আনন্দবনে'-ই হোক। শ্যামলী সবখানেই ছুটে গিয়েছে। ভাগলপুরের বীভৎস দাঙ্গায় আহতদের দেখতে, তাদের মনোবল জোগাতে ছুটে গিয়েছিল গৌরদার (গৌরকিশোর ঘোষ) সঙ্গে। আবার কুড়ি বছরের পরে, এই সেদিন ২০০৯- তে আরেকবার ফিরে গেল ভাগলপুরের বর্তমান পরিস্থিতি কেমন, সেটা সরেজমিনে দেখে আসতে। চিরশত্রু শরীরকে কিছুতেই পাত্তা দেয়নি মেয়েটা। ভাগ্যিস দেয়নি? তাই তো এত কাজ পেরেছে, এত আনন্দ পেয়েছে, এত আনন্দ দিয়েছে। আমার সঙ্গে শ্যামলীর একটাই মিল, আমারও শরীর চিরশত্রু। কিন্তু শ্যামলী চিরজন্ম বেঁচেছে শুধু অপরের জন্যে। জগতের জন্যে। তার দেহ-প্রাণ সঁপে দিয়েছিল মানুষের সেবায়। জরুরি বলে সে যা বিশ্বাস করে, এবং সত্য বলে সে যা বিশ্বাস করে, তার জন্যে সে সব কিছু ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল। আমি কি তেমনটি পেরেছি?

শ্যামলীর সাজগোজে মন ছিল না। যেমন-তেমন শাড়ি, আর আধো খুলে পড়া এলো খোঁপা, কপালের ওপরে ঘেঁটে যাওয়া কুমকুমের টিপ, ধুলোমাখা চটি পায়ে, পাগলির মতো এলোথেলো চেহারা করে, মিষ্টি হাসিভরা মুখে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হাতের মুঠোয় নিয়ে ঘুরে বেড়াত সেই করিতকর্মা মেয়ে। তার সবখানি অস্তিত্বই ছিল তার ভিতরটুকু নিয়ে। শ্যামলী সব জায়গায় দুর্বলের কাজে লাগার সুযোগ খুঁজে নিত, সে অনাথ শিশুদের পড়ানোই হোক, আর লিট্‌ল ম্যাগাজিনদের সাহায্য করাই হোক। মেলার

Scanned by CamScanner

সময়ে দেখেছি বীরভূমের নানা লিট্‌ল ম্যাগাজিন তার কাছে নানাভাবে কৃতজ্ঞ। শ্যামলীর স্বভাব ছিল মানুষকে উপহার দেওয়া। আমার মেয়েদের যখনই দেখা হত শ্যামলী মাসির সঙ্গে, সে তাদের হাতে কিছু না কিছু আদরের উপহার তুলে দিত। সবসময়েই তার অশেষ ঝোলার মধ্যে একটা কিছু স্নেহের চিহ্ন প্রস্তুত থাকত, সবার জন্যে। কখনও মালা, কখনও পুতুল, কখনও চুড়ি। আমার জন্যেও বরাদ্দ ছিল কখনও ভবানীপুরের গুজরাতি নোন্তা, কখনও রামদেবের দোকানের কবিরাজি হজমি, কখনও বনলক্ষ্মীর দারুণ পেয়ারার টফি। ওদের তৈরি পেয়ারার জেলি ছেঁকে ফেলার পরে ছাঁকনিতে ধরা উদ্বৃত্তটুকু ফেলে না দিয়ে এই টফি বানানোর সুবুদ্ধি শুনেছি বনলক্ষ্মীকে শ্যামলীরই দেওয়া। যেমন সোনাঝুরিবনে আজকের এই জমজমাট 'শনিবারের হাট' সাঁওতালদের অর্থনৈতিক সুবিধের কথা ভেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই আপনভোলা শ্যামলীর দ্বারাই, গভীর ভালবাসায় ও দূরদৃষ্টিতে। আগে ছিল শুধুই গ্রামের তৈরি পণ্য, শুধু সাঁওতালদের হাতে তৈরি শহরে দুর্লভ জিনিসের হাট। এখন জনপ্রিয়তার সঙ্গে-সঙ্গে তার চরিত্র পাল্টে যাচ্ছে। (আমরা কি প্রাণে ধরে ব্যবসার স্বর্ণসুযোগ গ্রামীণ গরিবমানুষদের হাতে একচ্ছত্র ছেড়ে দিতে পারি?) পান্নালালবাবুর শেষ জীবনে তিনি শ্যামলীর কাছেই থাকতেন, আর তাঁর সঙ্গে প্রত্যন্ত গ্রামে ঘুরে শ্যামলীর চোখে গ্রাম ধরা দিয়ে ছিল তার অন্তরাত্মা নিয়ে। পেশায় সে ছিল শিল্পী, তার বাবার মতো। বাবার ধরনেই ছিল তার তুলির টানও। সহজ বর্ণোজ্জ্বল আর তীব্র প্রাণের উচ্ছলতায় ছন্দোময়। খুব সহজে অনায়াসে সে এঁকে ফেলতে পারত বিশাল চিত্রপট, বিরাট আলপনা, কিন্তু বোধহয় শ্যামলী-র গভীরতারও বাঁধন ছিল মানুষ নিয়ে ভাবনার সঙ্গে।

সবাইকে চান্স পেলেই রেঁধে খাওয়াতে ভালোবাসত শ্যামলী। কত যে খেয়েছি ওর কাছে। শিল্পীর সৃজনশীলতা ছিল তার রান্নাতেও। অনায়াসে গল্প করতে করতে নিজের খুশিমতো আবিষ্কৃত উপায়ে নতুন নতুন রান্না করে ফেলত। শ্যামলীর হাতের স্বরচিত রান্নার স্বাদ কেউ ভুলতে পারে না। মিষ্টিও তৈরি করতে পারত হরেক রকমের। ঘরে সব সময়ে কিছু না কিছু থাকত তার, চায়ের সঙ্গে টা।

'পলাশ' ফাঁকা করে চলে গেছে শ্যামলী, কে জানে ওর শখের দুর্লভ গাছপালার এখন কী হাল হবে? এবারে আমি শান্তিনিকেতনে গেলে, বাইরে রিকশা দাঁড় করিয়ে রেখে, আলুথালু শাড়ি-শাল, ব্যস্ত মুখ-চোখ নিয়ে, একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গা যাওয়ার পথে— 'এখন শুধু এক মিনিট তোমাকে দেখতে এলাম'— বলে আমার কাছে এসে দাঁড়াবে না কেউ আর।

Scanned by CamScanner

শ্যামলীদির নিজের পরিবার ও ঘর থেকে বেরিয়ে বিকল্পের সন্ধান ও নির্মাণ

শ্যামলীদির লেখা 'বিস্ফোরণের মাঝখানে' (বি.মা.) বইয়ের 'জীবন-বিরোধী পারমাণবিক শক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

ভারতবর্ষে ফিরে আসার আগে, আমি ওয়াশিংটন ডিসি যাওয়ার দরকার বোধ করছিলাম, কেননা সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা সেখানে ছিলেন। সেখানে আমি পেয়েছিলাম "কমিউনিটি ফর ক্রিয়েটিভ নন্-ভায়োলেন্স" (CCNV) নামক গোষ্ঠীকে যাঁরা গৃহহীনদের সাহায্যের মাধ্যমে নিজেদের জীবন-পদ্ধতিতে অহিংস জীবনযাপন শিখছিলেন। তাঁরা প্রতিদিন কয়েকশো লোকের রান্না করতেন যারা কপর্দকহীন ফুটপাত-বাসিন্দা। এছাড়া তাঁরা যুদ্ধ-অর্থনীতি এবং অস্ত্র-ব্যবসার প্রতিবাদ করতেন। পরের কয়েকমাস আমি CCNV-কে আমার ঘর করেছিলাম, যখন আমি তাদের সাথে শান্তির জন্য সত্যাগ্রহে শামিল হয়েছিলাম। পেন্টাগন ও হোয়াইট হাউসের সামনের লনে প্রার্থনা করে এবং প্রতীক-কর্মসূচীতে অংশ নিয়ে গ্রেপ্তার হয়ে যে কেউ মার্কিন আদালতে ওদের খারাপ কাজগুলো নিয়ে বলার সুযোগ পেত। আর কিছু না হলেও, এটা কাউকে অন্তত বাধ্য করত তার নিজস্ব চিন্তা এবং উদ্দেশ্যকে বিচারক এবং জেলের অপরিচিত মহলে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে।

বেড়াতে বেড়াতে অনেক ঘুরে যখন কানাডাতে ফিরে এলাম আবার, ইতিমধ্যে আমারও জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে, জীবনে একটা পরিবর্তন আসা প্রয়োজন, সেকথা বুঝতে ভাবতে শুরু করেছি। আর প্রশ্নগুলো আগেই জেগেছিল, তখন নতুন করে সব বুঝতে পারছি। কিটিম্যাট বলে যে ছোটো শহরটায় আমরা থাকতাম, ফিরে দেখি ইতিমধ্যে সেখানে মহিলাদের একটা সংগঠন হয়েছে। ওখানে হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগটা ছিলই, প্রত্যেক বছর টাকা তোলার জন্য ওখানে নৃত্য ও ভোজের আসর হত, প্রত্যেকবারই আমি তাতে বিরাট বিরাট কাগজের রোলে ছবি এঁকেছি। ওই শহরে মেয়েদের সংগঠন আন্দোলনও নতুন তখন। আমার ইচ্ছে ছিল কো-অপারেটিভ গড়ে তোলার, লোকাল রিসোর্স দিয়ে যাতে কাজের জিনিস তৈরি করা যায়। কিটিম্যাটের কাছের বড়ো শহর ভ্যাঙ্কুভার, তাও প্রায় হাজার মাইল দূরে। ছিয়াত্তরের, সেবছর ভ্যাঙ্কুভারে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে হ্যাবিটাট কনফারেন্স হল। সেসময় ওখানে হয়েছিল কি, আমেরিকা থেকে অনেকেই ভিয়েতনাম যুদ্ধে যোগ দেবে না বলে চলে এসেছিল, ফলে ওখানেও যথেষ্ট বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধে যোগ দেব না, হাতের কাজ করব, এরকম

Scanned by CamScanner

একটা আশ্চর্য ধুয়া শোনা যাচ্ছিল। ভ্যাঙ্কুভারের চারপাশে ছোটো ছোটো অসংখ্য দ্বীপ আছে, বহুবছর ধরে শহর-সংস্পর্শের বাইরে অনেকে বাস করতেন সেখানে। এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাঁর তখন ছিয়ানব্বই বছর বয়স, কবিতা লেখেন তখনও, যুদ্ধ বিরোধী সভার খবর দিলে। ছোটোবেলায় তাঁর বাবা আমেরিকা থেকে চলে এসেছিলেন, চাষবাস করতেন, হাতের কাজ করতেন। ভদ্রমহিলা কোনোদিন স্কুলে যাননি, ছবি আঁকতেন। এঁরা সকলে কনজিউমারিজমের বিরুদ্ধেই চলে এসেছিলেন। নর্থ আমেরিকাতে এই ট্রাডিশনটা এখনো বোধ হয় খানিকটা আছে। থোরো সেই কোন যুগে 'ওয়ালডেন' লিখেছিলেন, সেই অনুভবটা এখনো রয়ে গেছে। সংখ্যায় খুব কম হলেও যাদের মধ্যে আছে একেবারে অবিশ্বাস্যরকমেই আছে। তো ভ্যাঙ্কুভারে এই হ্যাবিটাট কনফারেন্সে যোগ দিয়ে আমার একটা সুবিধে হয়েছিল যে কেউ আমাকে চেনে না, শান্তিনিকেতনেও যেমন অমুকের মেয়ে, অমুকের স্ত্রী পরিচিতি বা কিটিম্যাটেও অমুকের স্ত্রী, অমুকের-ইত্যাদি পরিচয় নিয়ে খুব একটা অসুবিধা হয় না অনেক সময়, বিশেষত যদি বেফাঁস কথা বলার অভ্যেস থাকে তো হ্যাবিটাটে সেই অসুবিধাটা একেবারেই ছিল না। ওখানে পাবলিক ফোরামে সকলেরই প্রশ্ন করার, আলোচনার অধিকার ছিল। অনেকগুলো মিটিং একইসাথে চলছে, যে-কেউ যে কোনো পোশাকে সেখানে উঠে কথা বলতে পারে। ওখানে অনেকের সাথে আলাপ হল , যুদ্ধের বিরুদ্ধে অর্থাৎ শান্তির কাজ করে যারা। তার মধ্যে অনেকেই সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই কাজ করছে।

হ্যাবিটাটের বাড়িগুলো— দেখতে বিশেষ ভালো নয়, সে বাড়িগুলো বিশাল পোড়োবাড়ির মতো। বিরাট বিরাট সব এরোপ্লেন হ্যাঙ্গার। ওই খালি হ্যাঙ্গারে আমার মনে হল যে কীভাবে কয়েকজন মিলে কিছু একটা করা যায়, কাজের সুযোগ তৈরি করা যায়। আর একটা কথা মনে হয় যে এই আর্ট গ্যালারি সিচুয়েশনটা ভাঙা দরকার, গ্যালারির থেকে ছবিটা উন্মুক্ত আলোয় প্রকাশ্যে বের করে আনা দরকার। বিদেশে আর্ট গ্যালারিগুলোর শাসন অনেক বেশি, তাদের কমিশন, তাদের ফরমাশ সব নিয়ে আর্টিস্টের আদৌ কোনো স্বাধীনতা থাকে কিনা সন্দেহ। এখন এখানেও বোধ হয় তাই চলছে। কিন্তু আমার মনে হয় জনসাধারণ ছবি কীভাবে কিনতে পারে, প্রয়োজনে অন্য জিনিসের বিনিময়ে, বার্টার সিস্টেমই চালু করা যায়। আমার ইচ্ছে ছিল সেরকম একটা বাজার, একটা ক্র্যাফট্ মার্কেট ওই হ্যাঙ্গারে তৈরি করার। সমুদ্রে অনেক কাঠ ভেসে আসত, লগিং ইন্ডাস্ট্রি আছে, হ্যাঙ্গারের আশেপাশে আগে থেকেই কেউ কেউ কাঠ কাটত, কার্ভিং করত, মূর্তি বানাত। পুরো জিনিসটাই একটা জীবন্ত, যেন হেঁটে চলে

Scanned by CamScanner

বেড়াতে শুরু করেছে তখন। একটি ছেলে, যে মহাবলীপুরমে ট্রাডিশনাল পাথর খোদাইয়ের কাজ শিখেছিল, টুল তৈরি করতে পারত নিজে, সে-ও তখন কাঠ কাটছে। নানান লোক এসে জুটল ক্রমে, কাজ শুরু হল, একটা কমিটি মতো ছিল। আমিও সেখানে মাটির কাজ শুরু করলাম। ইতিমধ্যে পীস গ্রুপগুলোর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। প্রিজনারস্ রাইট গ্রুপ বলে একটা দল জেলখানার বিরুদ্ধে প্রচার করত। আরেকটা দল ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সংগঠিত হয়েছিল, পরে জেলফেরত তারা একটা কমিউন স্থাপন করেছিলেন। স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে এক-একটা পরিবার, অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে কয়েকজন ওদের সঙ্গে থাকতেন। অনেকেই ক্র্যাফটের চর্চা করতেন, একজন ছিলেন পটার, চাক ঘুরিয়ে মাটির কাজ করতেন।

ইতিমধ্যে ইউনাইটেড স্টেটসের ট্রাইডেন্ট সাবমেরিন বেসটা যে খুব কাছেই, সেটা তাদের খেয়াল হল। জলের তো আর বাউন্ডারি নেই, আকাশের তো আর সীমানা বেঁধে দেওয়া যাবে না, ওরা প্রতিবাদ জানাতে শুরু করলেন। সত্যাগ্রহ, নন-ভায়োলেন্ট প্রোটেস্ট। নৌশিবিরে গাছ লাগালেন, মানে সিমবলিক্যালি, গাছ তো জীবনের প্রতীক। প্রত্যেকের ছ-মাস করে জেল হয়েছিল। কিছুটা আলোড়ন হল। এদের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল তখন, ওয়ার্কশপ করেছি একসাথে, ক্যাম্প করেছি। মনে আছে, বড়ো বড়ো সুপারমার্কেটের পেছনে গারবেজ থেকে নিয়মিত ওয়ার্কশপের খাদ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসতাম। ফলমূল, ডিম বা প্যাকেটের খাবার সব ডেট একসপায়ারড হয়ে গেলেই ফেলে দিত, যাতে দাম না পড়ে যায়। আর থার্ড ওয়ার্লড থেকেই এসবের অধিকাংশ আসত। প্রায় এসময় থেকেই আমি পোস্টার করতে শুরু করেছি। সেবার ওয়ার্কশপ শেষ হওয়ার পর আমরা তিনজন মেয়ে অ্যারেস্টেড হলাম স্বইচ্ছাতেই। শুধু আলোচনা চলছে, মনে হচ্ছিল এক্ষুনি যেন প্রতিবাদ করা দরকার। আর আমাদের অ্যারেস্ট করল কারা?— পুলিশ নয়, প্যান অ্যাম গার্ডস। যার মালিক রকফেলার। আটাত্তরে আমার ছেলেও, তার দশ বছর বয়সে প্রতিবাদস্বরূপ জেলে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে ট্রাইডেন্ট বেস-এর অনেকে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। এমনকী বব অলড্রিজ যিনি মূল ডিজাইনার, তিনি চাকরি ছেড়ে এখন শান্তির কাজ করেন। ট্রাইডেন্টের সমস্ত সিক্রেট তিনি ওপেন করে দিয়েছেন। সাতাত্তরে আমি জেলে যাওয়ার পর ঠিক করলাম যে আর ওই জীবনযাত্রায় ফিরব না, বড়ো ডেভেলপারের অ্যাপার্টমেন্ট তার সুখী নিষ্ক্রিয়তা আমার ঠিক পোষাবে না। এদিকে জেলে যাচ্ছি, মুখে বলছি যে পীসের কাজ করব, অথচ যেভাবে জীবন চলছিল আমার, ওই ক্রেডিট কার্ডের সভ্যতার অংশী— এ দুয়ের মধ্যে কোনো মিল

Scanned by CamScanner

নেই, কোনো সম্পর্ক নেই। তো, আমি ছেলেকে নিয়ে তারপর ওই এ্যারোপ্লেন হ্যাঙ্গারে উঠে এলাম। সমুদ্রের ওপর একেবারে, কিন্তু হিটারের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। শীতেও ওখানে তখন জনাদশেক ছিলেন, কাজ করতেন। এক শিল্পীও ছিলেন। এস্কিমোদের নিয়ে আর্ট-কোঅপারেটিভ করেছিলেন একটা, প্রিন্টমেকিং-এর। বেশিরভাগই অবশ্য কাঠের কাজ করত। তারপরের বছর ওই হ্যাঙ্গার থেকে অনেক আর্টিস্ট গিয়ে স্বেচ্ছায় অ্যারেস্টেড হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত নি-চি-জু (Ni-Chi-Zu) আর্টিস্ট ওয়ার্কশপটা বেশিদিন চলেনি। তার একটা কারণ বোধ হয় শহরের মধ্যে একদল আর্টিস্ট সেলফ্ সাফিসিয়েন্ট্ বা স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে, এটা সকলের চোখে ভালো ঠেকেনি। বিশেষত সরকারের। এসময় আমি ওখানে অ্যালকোহলিক মায়েদের ছেলেমেয়ে দেখাশোনা ও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সেবালব্ধ সংগঠনে কাজ করছি, (কিছুটা গৃহ পরিচারিকার কাজও) অন্তত খাওয়ার খরচটা যাতে উঠে আসে সে দায়িত্বও ভুলে গেলে তো চলবে না। এদিকে টেরাকোটা করছি, পীস র‍্যালি, পীস ডেমনোস্ট্রেশনের জন্য পোস্টার করছি— এভাবে এগোচ্ছিল। মনে আছে একবার ৬ আগস্ট হিরোশিমা দিবসে আমরা স্ট্রিট-অ্যাক্ট করেছিলাম— সাইরেন বাজতেই যে যেখানে ছিলাম সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়েছি। সে যাই হোক, হ্যাঙ্গারটা কিন্তু শেষপর্যন্ত রাখা গেল না। মাঝরাত্রে পুলিশ এসে আমাদের তুলে দেয়। ওদেশে বলে যে ফ্রি এন্টারপ্রাইজ, কিন্তু ফ্রি এন্টারপ্রাইজ বলে কোনো ব্যাপার নেই, যাই করতে যাও তুমি, লাইসেন্স লাগবে, যে কেউ যা কিছু ভালো লাগে বিক্রি করে দু-মুঠোর সংস্থান করবে তার উপায় নেই। একটি আমেরিকান মেয়ে বলেছিল যে তার বাবা নিজেই টিনের বাঁশি তৈরি করে ঘুরে ঘুরে ফিরি করতেন, কিন্তু তা চলবে না, সেটা ওদের চোখে গর্হিত অপরাধ। ওখানে শুধু মাল্টিন্যাশনাল চলবে।

হ্যাঙ্গারে যে কেউ এসে কাজ করতে চাইলে দেখিয়ে দেওয়ার লোকের অভাব ছিল না, সকলের জন্যই অবারিত দ্বার। তার কিছু অসুবিধাও ছিল— প্রায়ই রান্নাঘরে খাওয়ার সময় অচেনা মানুষজনে ঘর উপচে পড়ত, শেষে খাদ্যেই টান পড়ত। খিচুড়ি আর বড়োজোর একটা স্যালাড— তারই এত চাহিদা। আমরা কয়েকজন পার্টটাইম চাকরি করে বা ছবিমূর্তি কমদামে বেচে ভাঁড়ার যাতে শূন্য না হয়, সেদিক নজর রাখতাম। কিন্তু দুবছর যেতে না যেতেই এতদিনের স্বপ্ন যে বাস্তবেও সম্ভব তা প্রমাণ করেই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ক্রেডিট কার্ডের দেশে এত সহজে স্বাবলম্বী প্রেমিক হতে পারলে যে যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবসায়ীরা বেকার হবে, তাই না?

Scanned by CamScanner

আমাদের চোখে শ্যামলীদির প্রাসঙ্গিকতা

শান্তিনিকেতনের কাছে তিলুটিয়া গ্রামে অমরেন্দ্র কাজির আশ্রমের সঙ্গে শ্যামলীদির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সেখানেই শ্যামলীদির ইচ্ছামত ওঁকে কবরস্থ করা হয়। এই ভাবে ওঁর শরীরী সত্ত্বা শেষ অবস্থান নেয় মাটির তলায় ওঁর ভালোবাসার জায়গায়। সেখানে একটা কুল গাছ আর কত কী জন্ম নেবে। বাচ্চাদের আর সকল প্রানীর 'আনন্দে' লাগবে। এখানে বিশ্বময় বাস্তুতন্ত্র বা বসুন্ধরার অজস্র বস্তুর ধারা শ্যামলীদির শরীরে মিলিত হবে, অজস্র নতুন ধারার জন্ম দেবে। ওই ধারাগুলি আমাদের মধ্যে ও সমগ্র বসুন্ধরায় ছড়িয়ে পড়বে, যাত্রা করতে থাকবে। বসুন্ধরার মঙ্গলময় যোগাযোগ বাড়িয়ে চলবে। এটা খুব সুন্দর প্রতীক।

শ্যামলীদির জীবনযাত্রার একটা সাধনার দিক ছিল, যাতে আমরা যে ওই বসুন্ধরা মায়ের শরীরের একটা অংশ, বসুন্ধরার একটা চলমান সৃষ্টি সেটা হৃদয়ঙ্গম করা। আমি যদি 'বসুন্ধরা'-কে একটা অন্তহীন উর্বর জমি বা অরণ্য বা সমুদ্রের মতো ভাবে দেখি তাহলে আমি তার মধ্যে একটা কেঁচো বা গাছ বা ঢেউ, একটা ধারা প্রবাহ, এক চলমান সঙ্গম। আমি আর ওই বসুন্ধরার প্রতিটি সৃষ্টি, অংশ সব সময়ে একে অন্যকে প্রভাবিত করছি ও নির্মিত করে প্রবাহিত হচ্ছি।

বসুন্ধরার যেমন একটা বস্তুগত দিক আছে, তেমনি তার তৈরি মানব সমাজের একটা সামাজিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক দিক আছে। যেই অজস্র সামাজিক মানসিক প্রবাহ ধারাগুলি শ্যামলীদির মধ্যে মিলিত হত, পরিবর্তিত হত আর আবার বসুন্ধরায় ছড়িয়ে পড়ত— তাদের যাত্রাকেও আমরা ওই ওপরের প্রতীকের মতো দেখতে চাই। বসুন্ধরার বস্তু ও প্রাণী জগতের ও তার মানব সমাজের অজস্র সুন্দর ধারা শ্যামলীদির মধ্যে মিলিত হত, তারপর তা আমাদের সকলের মধ্যে, সমস্ত বসুন্ধরাতে বয়ে চলত, বয়ে চলেছে। (হ্যাঁ, অসুন্দর ধারার দিকগুলিও আছে। যা আমাদের সকলের মধ্যেই আছে। ওগুলি জানার মতো ঘনিষ্ঠতা ওঁর সঙ্গে আমাদের হয়নি।)

এই ভাবে দেখবার পদ্ধতি বৌদ্ধ, সুফি/বাউল-ফকির, মানব ধর্ম, রবীন্দ্রনাথ সহ বহু দর্শনে ও বসুন্ধরা রক্ষার আন্দোলনে (যেগুলোর সঙ্গে শ্যামলীদির যোগ ছিল) এবং অনেক পশ্চিমী প্রতিষ্ঠান-বিরোধী দার্শনিক আন্দোলনে পাওয়া যায়। এই ভাবে দৃশ্য ও অদৃশ্য ধারাগুলিকে দেখার পদ্ধতি আমরা আমাদের পুরো লেখাতে স্পষ্ট করবার চেষ্টা করব।

Scanned by CamScanner

শ্যামলীদির সঙ্গে আলাপ ৮০-র দশকে—'৮৪ বা '৮৫-তে। ওঁর সঙ্গে দেখা হবার আগেই আলাপ। পরমাণু বিরোধী আন্দোলনের বন্ধুরা ওঁর কথা খুব বলত। অতীতের (প্রবাহগুলি— যা আজও বইছে সেই) স্মৃতির অনুভব এখানে পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই।

১

যে সৃজনগুলি দেখা যায় না, আর 'কর্ম' বলে গণ্য করাও হয় না: সমাজমঙ্গলের দিশাতে গভীর আদান-প্রদান, ভালোবাসা, বিশ্বাস নির্মাণ

ওঁর বাড়িতে, ওঁর কাছাকাছি এলেই অনেক সুন্দর সম্পর্ক, সমঝদারি বোধ নির্মিত হত। তিনটি উদাহরণ দিচ্ছি:

ওঁর বাড়িতে বসলে অনেকের সঙ্গে আলাপ-সংলাপ হত যারা গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ, জয়প্রকাশ নারায়ণ ইত্যাদি পরম্পরাতে মঙ্গল-মুক্তির ধারাগুলি, তাদের তর্ক, ভিন্নতা— এসব নিয়ে অনেক ভাবেন। বিশ্ব বাজার, ভোগবাদ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি ও পণ্যসর্বস্বতা আবার কর্তৃত্ববাদ (তা বুর্জোয়া বা কম্যুনিস্ট), বশংবদ মানসিকতা, ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে এগুলি কীভাবে হবে আর সমাজ মুক্তির পথে এর ভূমিকাই বা কী? জীবনে আনন্দ পাওয়া কখন আমাদের নানা রকম প্রতিষ্ঠান ও পুঁজিবাদের শিকার বানাবে আর কখন তাকে দুর্বল করবে? একঘেয়ে, অ-সৃজনশীল, আরোপিত শ্রম— যেমন, চরকা চালানো— একে কী চোখে দেখব? আবার স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে দারিদ্র্য কম করবার কোন পথ বাছব? পশ্চিমী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কীভাবে কতটা গ্রহণ করব। বিশ্বের সঙ্গে আমাদের অন্তর্সম্পর্ক, মূল্যবোধের জগৎ, অন্তর্যাত্রা, অন্তর পরিবর্তনের প্রচেষ্টা, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক জীবন এই সব বিষয়ে কী করব, কী ভাবব? প্রতিষ্ঠানের ধর্ম, সামাজিক অনুশাসনের মোকাবিলা কোন পথে হবে?

ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গল ও মুক্তি, বৈষম্য-শোষণ-শাসন বিরোধিতার বিষয়ে, রবীন্দ্র-গান্ধি পরম্পরা, কত পরীক্ষা, নিরীক্ষা, আলোচনা, তর্ক, ভুল-ভ্রান্তি করেছে তা জানবার অনেক দরজা আমার সামনে খুলে যেতো। আমাদের 'বামপন্থী' উচ্চ পরম্পরার প্রভাবে আমার এই বিষয়গুলি জানবার দরজা বন্ধ ছিল। বাক্সবন্দি আমার মন এদের ছাপ্পা লাগানো, এদের দুর্বল দিকগুলিকেই দেখতে অভ্যস্ত ছিল। আমি শ্যামলীদির বাড়িতে অবাক হয়ে শুনতাম— এই সব অ-বাম ধারাতে মঙ্গল-মুক্তির কত আর্তি, অভিজ্ঞতা, চিন্তা-ভাবনার ধারা বয়ে চলেছে!

Scanned by CamScanner

পান্নাদা

আরেকবার গেছি। তখন পান্নালাল দাশগুপ্ত শ্যামলীদির অতিথি। ওরকম তথাকথিত কিংবদন্তি নায়কের সঙ্গে শ্যামলীদি আলাপ করিয়ে দেবার পরই মুখচোরা আমার কী যেন হল। ওনাকে আমার 'নায়ক'দের সম্বন্ধে বিক্ষোভ-অভিযোগ জানিয়ে ফেললাম।

আমি বললাম, আপনি সব সময় মহান স্বপ্ন দেখিয়েছেন। মুক্তির রাজপন্থা উদঘাটন করেছেন, সাচ্চা পথের নেতৃত্ব দিয়েছেন। কখনো সশস্ত্র কমুনিষ্ট বিপ্লব, কখনো কেমিকাল সার ব্যবহারে সবুজ বিপ্লব, কখনো গান্ধিবাদী, মাসানুবো ফুকুওকাবাদী— রসায়ন-শিল্প বর্জন করে প্রাকৃতিক চাষবাস করে মুক্তি। সব সময়েই চূড়ান্ত সমাধান দিয়েছেন; আর আপনার যুক্তি, ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাসের চাপে বহু অনুগামীও ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আপনি কেন নিম্ন-ছোটো স্তরে, সামান্য সৃষ্টি, অনেকের পাশাপাশি পথ হাঁটতে পারেন না?

অনামি, অচেনা এরকম কণ্ঠ শুনে শ্যামলীদির সামনে, পান্নাদা কিছুক্ষণ চুপ। তারপর বিব্রত গলায় বললেন,- আমি ভাই ওসব বড়ো বিপ্লবের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছি। আমি একেবারে ছোটো কাজ, ১০০টা গ্রামে বিকল্প নির্মাণের কাজের দায়িত্ব নিয়েছি।

আমি বললাম, বাব্বা! লোকে একটা গ্রামে বিকল্প নির্মাণ করতে হাবুডুবু খায়। আর আপনি ১০০টা গ্রামে? এই আপনার 'ছোটো' ? পান্নাদা তখন কেমন যেন কুঁকড়ে যান। আবেগের সঙ্গে বলেন: এই দেখো, আমার হার্ট-এ বাইপাস হয়েছে। আমি দুর্বল। আমার এখন একজনই ক্যাডার আছে, সে আমি নিজে। উনি বলেন যে ওনার বিশ্বস্ত অনুগামীরাও ওঁর ওপর বিশ্বাস রাখে নি। উনি ওঁর বিশাল এন.জি.ও- প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি, দায়িত্ব কাকে দেবেন, ওঁর পরে এসব কর্মকাণ্ড কে সামলাবে তাও খুঁজে পাচ্ছেন না। উনি খুবই সমস্যাগ্রস্ত ও একাকী।

সমরদা

শ্যামলীদির বাড়িতে আরেক সন্ধ্যায় সমর বাগ্‌চি ও অন্য কয়েকজনের সঙ্গে গভীর সংলাপে প্রবেশ করি আমরীন ও আমি।

কথা প্রসঙ্গে আমরীন বিজ্ঞানবাদ ও যুক্তিবাদকে কড়া সমালোচনা করছিল। সমরদা অবাক হয়ে বললেন, শোষণ-বিরোধিতার জায়গা থেকে তোমাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তা পদ্ধতির সমালোচনা কেন? আমরীন বলল, "আমরা অবশ্যই মনে করি বৈজ্ঞানিক বা

Scanned by CamScanner

সমালোচনামূলক যুক্তির পদ্ধতি শোষণ-অন্যায়ের ব্যবস্থার চালু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলির স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করে ও এগুলো তার বিরোধিতা করবার একটা প্রধান হাতিয়ার। এই পদ্ধতির ব্যবহারে আমরা বহু বিষয়ের কখনও পুরোটা, কখনও আংশিক বুঝতে পারি। কিন্তু এই পদ্ধতি কি আমাদের মনস্তাত্বিক জগৎ, আমাদের অস্তিত্ব, সম্পর্ক, সমাজ, বিশ্ব— সকল বিষয় পুরোপুরি বোঝার চাবিকাঠি? বিজ্ঞানের পদ্ধতি, বুদ্ধি ও চেতনা দিয়ে কি আমরা আমাদের স্বপ্ন, আকাঙক্ষা, অনুভূতির জগৎ, আমাদের মূল্যবোধ, রিপু-তাড়না বা সহমর্মিতার সমস্ত ধারাগুলোকে পরিচালনা (ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ, পরিবর্তন) করতে পারবো? 'করতে পারবো' এই বিশ্বাস, এই দর্শন হল যুক্তি বাদ। এটা ৩০০ বছর আগে পশ্চিমের নির্মাণ। এটা ওই পুরোনো সময়কার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, চেতনা ও বুদ্ধির শক্তিতে অন্ধ ভক্তি। এটা আমাদের অহংকারী ও অন্ধ করে রাখে।" সমরদা এ ব্যাপারে অনেক আলোচনা চান, অনেক প্রশ্ন তোলেন। আমরা কলকাতা ফিরে এটা নিয়ে বসব ঠিক করি। সেটা করা হয়নি।

কিন্তু শ্যামলীদির কথা লিখতে বসে আমাদের কার সঙ্গে কী আলোচনা হয়েছে তার প্রাসঙ্গিকতা কতটা? সবটাই। অথচ এই সব ঘটনাতে শ্যামলীদির দৃশ্যত ভূমিকা থাকত তাঁর উপস্থিতি, আতিথেয়তা, আগ্রহ, টুকরো টুকরো মন্তব্যে। তবুও বলছি, ওঁর ভূমিকাই ছিল সবকিছু। আগুনের উত্তাপ দেখা যায় না কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করা যায়। শ্যামলীদির প্রভাব-প্রবাহগুলো এমন এক পরিবেশ তৈরি করত যা আমি স্পষ্ট টের পেতাম। তা এক স্নিগ্ধ উষ্ণতা নিয়ে আমাদের অন্তর দিয়ে প্রবাহিত হত, গভীর প্রভাব সৃষ্টি করত। আমরা আমাদের দম্ভ, ক্ষমতার বর্ম, হাজারো গন্ডি ছিন্ন করে একটা আন্তরিক, খোলা মনের সংযোগ গড়তে পারতাম। আমরা এমন সব সংলাপ, আদান-প্রদান গড়তে পারতাম যা অন্যত্র ভাবাই যেত না। হ্যাঁ, বীরভূমে বা কলকাতায় "শ্যামলীদি আপনার কাছে পাঠিয়েছে" বললেও একটু তো যাদুস্পর্শ হত, অনেক বাধা কেটে যেত। কিন্তু ওঁর বাড়িতে, ওঁর পাশে যা হত তা তো অদ্ভুত যাদু।

Scanned by CamScanner

শ্যামলীদির যাত্রা— 'আমরা বাম-ওরা ডান' বিভাজনের পরম্পরার বিকল্প। বামপন্থার পক্ষে-বিপক্ষে নয়, বরং 'বাম' বা 'ডান' নির্বিশেষে পুঁজি-রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব, তার সঞ্চয়ন-উন্নয়ন, সকল যুদ্ধ, বলপ্রয়োগ, সকল বৈষম্যবাদ, সব ধরনের উঁচু-নিচু বাদের পক্ষে- বিপক্ষে। এসবের বিরোধী জগতে সকল 'আমরা-ওরা'- এর বিপক্ষে।

বোধ হয় তিরিশের দশক থেকে আমাদের সমাজ মঙ্গল-মুক্তির জগতে বাম-ডান বিভাজন আমাদের ব্যাপক ভাবে দখল করে। এই 'আমাদের পন্থা শ্রেষ্ঠ'- এর পথ ধরে আসতেই হয় বামের মধ্যে 'আমরা সাচ্চা'-'ওরা মেকি', 'আমরা সংবেদনশীল-ওরা নয়'। মতান্তর থেকে মনান্তর। অজস্র কলহ কলুষ। শ্যামলীদির যাত্রা আমাদের ওই চেনা জানা মুরুব্বিয়ানা, রক্ষণশীলতা ও সন্দেহ-বিদ্বেষের পরম্পরার জগতে এক লাগাতার বিকল্প।

পুঁজিবাদ- শোষণ-শাসন-বৈষম্য-প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা-বিদ্রোহের বিষয়টিতে শ্যামলীদি কিন্তু এশিয়াতে প্রচলিত 'বামপন্থা'-র জগতের বহু মৌলিক খামতি পেরিয়ে গেছিলেন। ওঁর কাছে স্পষ্ট ছিল যে ওই প্রতিষ্ঠানগুলির মূল উচ্ছেদ করতে গেলে আমাদের কারখানা ও নগরকেন্দ্রিক সমাজ, তার উৎপাদন, সঞ্চয়ন, ভোগের প্রতি একনিষ্ঠতা, তার বাজার, মুদ্রা, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ও উপভোক্তাবাদ, জীবাশ্ম (কয়লা, তেল, গ্যাস) শক্তি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা, এই মডেলে 'উন্নয়ন'— এ সব কিছুরই বিরোধিতা করতে হবে। আজকেই এর যতটুকু সম্ভব ততটুকু বিকল্প হাজির করতে হবে। এর যে অজস্র বিকল্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রবহমান তাকে সমর্থন করতে হবে। এশিয়াতে বাম পন্থার সাবেকি চিন্তা ছিল যে "ওসবই থাকবে, এই হল প্রগতি ও মুক্তির পথ। শুধু পুঁজিপতি শ্রেণীর জায়গায় কোনো শ্রমিক শ্রেণীর সাচ্চা প্রতিনিধি বা রাষ্ট্র কর্তৃত্ব করবে আর তাহলেই সকল সমস্যার সমাধান হবে।" শ্যামলীদির স্পষ্ট মত ছিল যে এই রকম 'উন্নয়ন ও প্রগতির' পথে কোনো মৌলিক সমাধান আসতে পারে না। তাই আবশ্যক ওই সকল ব্যবস্থার ও তাদের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক-আত্মিক ভিত্তিগুলির মূল জর্জরিত করা, তাদের যতটুকু পারি উচ্ছেদ করা। আবার এই বিদ্রোহের একটি প্রধান চালিকা শক্তির জন্য চাই বিকেন্দ্রিক, স্বনির্ভর, অ-নেতৃত্ব নির্ভর সমাজ ব্যবস্থা ও ব্যক্তির বিকাশ। চাই এর উপযোগী জীবনচর্যা, আত্মিকতা, সংস্কৃতি। চাই এই বিকল্পের যতটুকু (আছে ও গড়ে তোলা) সম্ভব তা আজকেই সমর্থন করা। বিদ্রোহের সঙ্গে বিকল্প নির্মাণ চলবে ব্যক্তিজীবন ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে।

Scanned by CamScanner

অন্যদিকে শ্যামলীদি তথাকথিত অ-বাম সংগঠন, গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ-এর সঙ্গে যুক্ত চালু পরম্পরাগুলির সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে এগিয়েছিলেন অনেক দুর। ওই পরম্পরাগুলিতে পুঁজিবাদী শোষণ, সকল বৈষম্য-অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ভূমিকা, এ বিষয়ে প্রতিরোধে বঞ্চিতদের নিজের স্ব-উদ্যোগের কেন্দ্রিয় ভূমিকার বিষয়গুলি সম্বন্ধে বোধ খুব দুর্বল ছিল। শ্যামলীদি এ সব বিষয়ে পরিষ্কার ছিলেন। এ ব্যাপারে উনি ছিলেন লোহিয়া, জয়প্রকাশ নারায়ণদের প্রতিরোধ ভিত্তিক ধারাগুলির খুব কাছে। আবার এই ধারাগুলির পার্লামেন্ট, ক্ষমতা প্রতিষ্ঠান, দলীয়তা, উচ্চাসনে যাওয়ার ঝোঁকের থেকে শ্যামলীদি দূরে থাকতেন, মৃদু ভাষায় নিজের আচরণ দিয়ে সমালোচনা করতেন।

আসলে শ্যামলীদির সাংগঠনিক ও চিন্তার মর্মে ছিল ব্যক্তির, তাঁর সমধর্মী বন্ধুদের স্ব-উদ্যোগ আর উদ্যোগীদের গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিক সহযোগিতার সংগঠন। এই উদ্যমগুলির সমতলিয় (horizontal) সংযোগ। উনি বঞ্চিত বা সরাসরি আক্রান্তদের আন্দোলনের ক্ষেত্রগুলি ছাড়া মুক্তিকামী জগতে অন্য কোথাও কর্মী-গোষ্ঠী -নেতাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি, জমিদারি বাড়ানো পছন্দ করতেন না। কোনো ব্যক্তিরই অন্যের প্রভাবাধীন হওয়া বা নেতা হওয়ার সামাজিক সংস্কৃতি-মানসিকতাকে শ্যামলীদি তাঁর অভ্যাস মতো হৃদয় দিয়ে ও আচার আচরণ দিয়ে বিরোধিতা করতেন। গোষ্ঠী প্রভাব বাড়ানোর লড়াই শ্যামলীদি তীব্রভাবে অপছন্দ করতেন। এমনকী মঙ্গলকামী জগতে কারুকে জোর গলায় খণ্ডন করাও ওঁর মানসিকতাতে একেবারে ছিলনা।

শ্যামলীদির জীবনের ধারাগুলি অবিরাম দেখতে সাহায্য করে ডান-বাম বিভাজনের পরম্পরা কত ক্ষতিকারক, তা কীভাবে আমাদের ছকবন্দি করে, আত্মতুষ্টি, অন্ধতা, সংকীর্ণতা, রক্ষণশীলতা ও সন্দেহরোগ (Paranoia)-এর আবর্তে ডুবিয়ে ফেলে।

'বামপন্থা' নির্মাণের প্রাণকেন্দ্র সম্ভবত এই বিশ্বাস যে একটা সঠিক, সাচ্চা মতবাদ আছে (ধর্মে সদগুরুর মতো) এবং তার ধারক বাহক কর্মী ও বাহিনীই পারে সমাজকে মুক্ত করতে। তার আগে অবশ্যই ওই 'সঠিক পন্থা ও নেতৃত্বকে' শোষিত জনগণের জগতে নিজের প্রভাব-প্রতিষ্ঠান-জমিদারি বাড়িয়ে যেতে হবে।

শ্যামলীদির ধারা ওই বিশ্বাসকে সব দিক দিয়ে জর্জরিত করত। বামপন্থার ওই বিশ্বাসের ফলে আমরা সমাজে এক নতুন ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের মতো বর্ণ বিভাজন করতে থাকি। এখানে একদিকে থাকছে 'উচ্চ চেতনায় সজ্জিত বিপ্লবী নেতৃত্ব-কর্মী', আর অন্য দিকে

Scanned by CamScanner

'সাধারণ চেতনায় ডুবে থাকা সাধারণ মানুষ'। শ্যামলীদি এভাবে দেখারও সামগ্রিকভাবে গভীর বিরোধিতা করতেন।

এই বিরোধিতা অবশ্যই আক্রোশ, ঘৃণা, ক্রোধ, সংগ্রাম করে নয়। তা একটা পাল্টা মত বা তত্ত্ব ভিত্তিক কেন্দ্রিকতা গঠন করে নয়। উনি ওঁর অবচেতন ও সচেতন জীবন, ওঁর অতীত ও বর্তমান সম্পর্কগুলির চরিত্র, কর্ম, বিকল্প নির্মাণ দিয়েই ওই ধারাগুলি ভাঙতে থাকতেন।

তাহলে বিকল্প ধারা সম্বন্ধে শ্যামলীদির ধারণা ও যাত্রা কেমন ছিল?

মঙ্গল-মুক্তিকামী ধারা-প্রবাহ ও চেতনাকে শ্যামলীদি একটা গণ্ডিবদ্ধ বাক্স বা 'বাদ' এর মতন দেখতেন না। ওই চেতনাকে একটা সার্চ লাইটের মতন দেখতেন না যাকে কোনো নেতৃত্ব বা 'বাদ' বহন করছে। উনি এই চেতনাকে এমনভাবে দেখতেন যা অজস্র ধারার মতো, কুয়াশার কণার মতো আংশিক ও খণ্ড খণ্ড ভাবে সকলের মনোজগতে বয়ে চলেছে। 'সাধারণ মানুষ', ব্যক্তিজীবন, সম্পর্ক, সকল কর্ম জগতের মধ্য দিয়ে তা বয়ে চলেছে। গ্রামের বা শহরের মানুষ, কারিগর, চাষি, মজুর, বাউল-ফকির— সকলের জগতের মধ্য দিয়ে ওই মঙ্গল মুক্তিকামী ধারাগুলো বয়ে চলেছে। সংযুক্ত ও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই প্রবহমান অজস্র টুকরো টুকরো, ধারাগুলোকে তুলনা করা, কোনোটা ওপরে কোনোটা নিচে এরকম সারিবদ্ধভাবে সাজানো যায় না। বরং এই টুকরো টুকরো ধারাগুলির নিবিড় অঙ্গাঙ্গী সংযোগ, এই সম্পর্কের রসায়ন বোঝাটাই আসল কথা। এই সংযোগ-রসায়ন তৈরি করতে থাকে বসুন্ধরা ও সমাজের এক মঙ্গল মুক্তিকামী দিক; যা একটা মহাসমুদ্রের মতো বাস্তুতন্ত্র। আমাদের জীবনে প্রবাহিত মঙ্গল-মুক্তিকামী ধারাগুলি ওই বাস্তুতন্ত্রকে নির্মাণ করে ও নির্মিত হতে থাকে। আমাদের মন ও জীবনের দৃশ্য ও অদৃশ্য, চেতন বা অচেতন সব স্তরেই ওই ধারাগুলি সংযুক্ত হচ্ছে, নির্মিত হচ্ছে। এই মহাসমুদ্রের মতো সামাজিক বাস্তুতন্ত্র অবশ্যই বিকেন্দ্রীক, অসীম-মাত্রিক অদ্ভুত বৈচিত্র্যময়, রহস্যময় ও তার প্রতিটি জায়গায়, প্রতি মুহূর্তে কত নতুন ধারা নির্মিত হচ্ছে। কোনো মতবাদ মুক্তিকামী জগতের অনেক কিছু জরিপ করতেই পারে। কিন্তু ওই সমগ্র মঙ্গল-মুক্তিকামী প্রবাহের জগতকে বুঝে ফেলার চাবিকাঠি কি সে দিতে পারে? এরকম কোনো চেতনার সর্বোচ্চ কেন্দ্র যদি না থাকে, তবে কীভাবে বলব যে কেউ বেশি সচেতন আর কেউ কম? মঙ্গল-মুক্তির ধারাগুলোতো অজস্র ধরনের। কেউ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে বেশি, কারুর মধ্যে করুণা, সহমর্মিতার ধারা বেশি বইছে। কেউ পরিবেশ ধ্বংস ও

Scanned by CamScanner

ভোগবাদ নিয়ে বেশি চিন্তিত, কেউ শোষণের সমস্যা নিয়ে। এইসব ধারাগুলি যদি 'আমি সর্বোচ্চ' বলে রেষারেষি করতে থাকে তাহলে মুক্তির ধারাগুলি আটকে যাবে, খণ্ডিত হবে।

তাই শ্যামলীদি সকল রকমে 'সাধারণ' মানুষ, কারিগর, চাষি , বাউল-ফকির, অথবা মঙ্গলকামী শিল্পী, বুদ্ধিজীবী যে কোনো রঙের বঞ্চনা বিরোধ- প্রতিরোধ, সংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বিরোধী আত্মিকতাকে ভালবাসতেন, তাদের শ্রদ্ধা করতেন। তাদের কোনো সরল মানদণ্ডে মেপে বেশি দামি-কম দামি বিভাজন করতেন না। ওঁ র চেষ্টা ছিল এর উল্টোটা, সকল মঙ্গলের খণ্ড ধারাগুলির মধ্যে সংলাপ-সংযোগ বাড়ানো, তাদের উর্বর, বহুরঙা ও সমৃদ্ধ করা। এরকম কেঁচোর মতন মঙ্গলপ্রাণ জমির মধ্যে সংযোগ উর্বরতা বাড়ানো, মথ-প্রজাপতির মতন অজস্র মুক্তিকামী ফুলের পরাগ মিলন ওঁর জীবনের অস্তিত্ব ও যাত্রার একেবারে মর্মে ছিল। উনি গভীরভাবে অনুভব করতেন যে মুক্তিকামী চেতনার কোনো এককেন্দ্রিক বা একটি ব্যাকরণ বা ছকবদ্ধ ধারণা, যে কোনো রাজনৈতিক সংগঠন কেন্দ্রীক আরোপণবাদী বিশ্বাস ওই মুক্তিকামী মহাসমুদ্রের সংযোগ খণ্ডিত ও দুর্বল করবে।

৩

শ্যামলীদির মঙ্গল-মুক্তিকামী বোধ-অনুভূতির জগতের নির্মাণ

একদিকে রবীন্দ্র-গান্ধি পরম্পরার সীমাবদ্ধতা ভাঙা, অন্যদিকে প্রচলিত বামপন্থার সীমানা ভাঙার বোধশক্তি শ্যামলীদির মধ্যে কীভাবে তৈরি হল, এর একটা সূত্র দেখা যাক।

শ্যামলীদি তাঁর বাবার বই ('আমার এ পথ'— সুধীর খাস্তগীর) এর মুখবন্ধে লিখছেন:

"আমি বিদেশে (বিয়ের পর) চলে যাওয়ায় (বাবা) খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন এবং সেসময় আমার জীবনযাত্রা তাঁকে যথেষ্ট পীড়া দিয়েছে, আজ তা ভালো ভাবেই বুঝি। ... আমার বিয়ের পর গতানুগতিক শহুরে জীবনযাত্রা অর্থাৎ আমি যে আমার উচিত কাজ করছিলাম না, বিদেশে গিয়ে আর পাঁচজনের মতো চোখ বুজে সবাই যা করছে, তাই করা যাক অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিকে উপেক্ষা করে জীবন কাটাচ্ছিলাম, সেটা তাঁর পক্ষে দেখা খুবই কষ্টকর ছিল। '৭৪ সালের ... হঠাৎ দুদিনের জ্বরে মারা যাবার আগের দিন এসব কথা নিয়ে বেশ তর্কও হয় আমাদের।... বাবা মারা যাওয়ার পর নানান ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে কেবলই মনে হয়েছে যে বাবা যেন ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে আমার চোখ

Scanned by CamScanner

ফোটাতে চেয়েছিলেন।...”

এ থেকে অনুমান করা যায় যে আমূল বিদ্রোহী যে শ্যামলীদিকে আমরা জানি সে কিন্তু ১৯৭৪ পর্যন্ত তেমনভাবে জন্ম নেয়নি। ’৬০-’৭০ দশকে পশ্চিমী দুনিয়ায় আরম্ভ হয় এক মূল উচ্ছেদকারী বিদ্রোহ-বিকল্প নির্মাণের মহাঝড়। এই ঝড় শুধুমাত্র পুঁজি ও রাষ্ট্রের শিল্পায়ন, নগরায়ণ, উৎপাদন, সঞ্চয়ন, উন্নয়ন, শুধু তার রাষ্ট্রবাদ, যুদ্ধ, প্রতিষ্ঠান— এর বিরুদ্ধে ছিল না। এই মহাঝড় এই ‘সভ্যতার’ সকল মূল্যবোধ, মানস, সকল নির্দয়তা, তার উপভোক্তাবাদ, বাজার ও পণ্য সর্বস্বতা, ভোগবাদ, লোভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, Paranoia-দ্বেষ-হিংসাকেই চ্যালেঞ্জ করে থামে না। এই মহাঝড় আমাদের নিজ সত্তার সঙ্গে, একে অন্যের সঙ্গে, সকল জীবের সঙ্গে ও প্রকৃতির সঙ্গে সহানুভূতি ও পারস্পরিক মর্যাদার, সম্পর্ক; আমাদের জীবন চর্যার জগৎ, তার আত্মিক বোধ, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির ওপর রক্ষণশীল সমাজ, সংগঠিত ধর্ম ও রাষ্ট্রের দখলদারির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এগিয়ে নিতে থাকে। সকল বৈষম্যতন্ত্র, গোষ্ঠিতন্ত্র, সংগঠিত ধর্ম, রাষ্ট্র ও ‘স্বাভাবিকত্বতন্ত্র’ গুলির দ্বারা আমাদের করুণা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, আনন্দবোধ, দুঃখবোধ, অনিশ্চয়তার সঙ্গে সহযাত্রা করার ক্ষমতা— এ সবগুলিকে দখল, বিকৃত ও ব্যবহার করার বন্দোবস্তকে ওই মহাঝড় জর্জরিত করতে থাকে, তার বিকল্প নির্মাণ করতে থাকে। একই সঙ্গে এই বিদ্রোহ-বিকল্প নির্মাণের ঝড় সকল কর্তৃত্ববাদকে প্রশ্ন করে। “কোনো ধরনের, উঁচু-নিচু নির্মাণ চলবে না।” মুক্তিকামী উদ্যোগের জগতে বিভিন্ন উঁচু-নিচুবাদী পরম্পরা যেমন, কর্মী-সাধারণ মানুষ, উচ্চ নেতৃত্ব, সচেতন-কমচেতন এই সকল আরোপণবাদ সবকে ওই মহাঝড় ধসিয়ে দিতে থাকে।

এই মহাঝড় শ্যামলীদির মধ্যে অনেক ফুল ফোটায়, বিস্ফোরণ ঘটায়। শ্যামলীদির লেখা ‘বিস্ফোরণের মাঝখানে’ আর ‘Let us give peace a chance’ বইগুলিতে এটা আমরা অনেকবার স্পষ্ট করে জানতে পারি। শ্যামলীদির বই থেকে ওঁর পশ্চিমি দুনিয়ায় বিদ্রোহ ও বিকল্প নির্মাণের ছোটো কয়েকটি উদাহরণ আমরা প্রথমে দিলাম। গান্ধি-রবীন্দ্রনাথ পরম্পরার মুক্তিকামী জমিন তো ছিলই। আবার ভারতের বামপন্থার রক্ষণশীল সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে শ্যামলীদি হয়তো কখনও ঢোকেনইনি। মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ, বিপ্লবী প্রতিপাদ্য, তার আরোপণবাদী, ফৌজি সারিবদ্ধতা, তার Social engineering (কুমোর যেমন মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ে, তেমনি তুমি মানুষ বদলে তাকে

Scanned by CamScanner

বিপ্লবের হাতিয়ার বানাবে এই প্রত্যয়)-কে গভীর সমালোচনা করেছিলেন 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে। শ্যামলীদির বাবা ১৯৪০-সালে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বন্ধু হন ও তখন তাঁর দুন স্কুলে এম. এন. রায় একটা বক্তৃতা দেন, কেন তিনি কমুনিজম্-এ বিশ্বাস হারিয়েছেন (আমার এ পথ-p.194)। আমাদের মনে হয়েছে যে শ্যামলীদি পূর্বের আর পশ্চিমের '৬০-'৭০-এর ধারাগুলির এক অসাধারণ সঙ্গম। উনি প্রজাপতির মতন তাদের পরাগ মিলন ঘটিয়ে চলেছেন-চলবেন।

৪
শ্যামলীদি এবং আমাদের আণবিক অস্ত্র ও শক্তি বিরোধী আন্দোলন

এই আন্দোলনের জগতে, ৮০-র দশকে শ্যামলীদি এক জ্যোতিষ্কের মতো প্রবেশ করলেন। এতে এই জগতের সঙ্গে যুক্ত 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মী' লিটল ম্যাগাজিন ও সম্পর্কিত বন্ধুরা আন্দোলিত হই। শ্যামলীদি এক অসাধারণ পোস্টার প্রদর্শনী নিয়ে সব জায়গায় যেতেন ও সংলাপ-যোগাযোগ তৈরি করতেন। তখন '৮০-র দশকের শুরুতে আমাদের এই পরমাণু অস্ত্র ও শক্তি বিরোধী জগতে বামপন্থার জোরালো প্রভাবে আমাদের মূল ধারার অবস্থানে অনেক খামতি ছিল। যেমনঃ

১। পরমাণু অস্ত্রের বিরোধিতা 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে করা যাবে না।

২। আণবিক শক্তি ভালো। তার যা কিছু সমস্যা এখন দেখছি, তা উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসীম ক্ষমতা সমাধান করবেই।

৩। যে যত চাইবে তত শক্তি ও ভোগ্যপণ্য প্রাপ্তি ও সেই পথে উন্নয়ন ঠিক পথ, মুক্তির পথ, পুঁজিপতিশ্রেণি শ্রমিকদের ভোগ্যপণ্য প্রাপ্তির রাস্তায় বাধা। পুঁজিপতিদের তাড়িয়ে দিলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্টের সমস্যা, কয়লা-তেলের শেষ হবার সমস্যা— সব সমস্যার সমাধান করবে সমাজতান্ত্রিক প্রযুক্তি। মানুষ মহাবলী হবে। সকলের থাকবে ফ্রিজ, মোটর গাড়ি আরও কত কী। এই প্রাচুর্যের যুগের আলাদিনের প্রদীপের জিন হল পরমাণু শক্তি। দূষণমুক্ত ও সীমাহীন। এই বিশ্বাসগুলি বামেদের মধ্যে এত গেঁড়ে বসেছিল (ও বুর্জোয়াদের মধ্যে তো বটেই) যে আমরা যারা এসবের ভ্রান্তি দেখতে পেতাম (যেমন বাদল সরকার) তাদের কথা কেউ শুনত না। লেনিন-মাও-বাদী বাম জগতের বাইরের ধারাগুলি অবশ্য এই সব ভ্রান্তির বাইরে ছিল। তারা (গান্ধি, রবীন্দ্র, জয়প্রকাশ সংশ্লিষ্ট বহু ধারা) আণবিক অস্ত্র, (ডান বা বাম যে

Scanned by CamScanner

কোনো) যুদ্ধ ও আণবিক শক্তির বিরুদ্ধে স্পষ্ট সোচ্চার ছিল। কিন্তু তাদের তো আমরা পশ্চিমবঙ্গে একঘরে করে রেখেছিলাম, সাম্যবাদী বলে গণ্যই করতাম না। তারা কী বলছে তা কে শুনবে? এই সব কারণে আমাদের ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত হিরোশিমা দিবস নিয়েও মাথাব্যথা ছিল না! এই সময় শ্যামলীদির আণবিক প্রতিষ্ঠানের আমূল বিরোধিতা নিয়ে আর্বিভাব। তিনি দিলেন আমাদের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি উপভোক্তাবাদী উন্নয়ন আর 'সমাজবাদের ভালো যুদ্ধের' বিশ্বাসের মূল ধরে টান। বামপন্থী অনেকে এবার শুনতে আরম্ভ করল।

আসলে শ্যামলীদি যখন এসে অন্ধ বিশ্বাসের বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিলেন তখন আমাদের দরজাটা খুবই নড়বড়ে হয়ে রয়েছে। চীন-ভিয়েৎনামের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রায় ৮০,০০০ মুক্তি সৈনিক নিহত হল। যুদ্ধ হয়ে গেছে ('৭৯ সালে)। রুশ সাম্রাজ্যবাদের রক্তাক্ত লম্বা ইতিহাস সামনে এসে গেছে। যা হোক, হঠাৎ আমরা হিরোশিমা দিবস পালন করতে আরম্ভ করলাম— ৪০ বছর দেরিতে হলেও। আণবিক শক্তির বিরোধিতা আরম্ভ করলাম। পায়ে পায়ে সবাই চলে এল হরিপুরে। সমাজবাদের প্রযুক্তির কল্পতরু সবাইকে দেবে এ.সি., ফ্রিজ, মোটর গাড়ি, এই বিশ্বাসে টান পড়ল। নানান দিক থেকে এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গভীর প্রশ্ন উঠল।

শ্যামলীদি তাঁর পোস্টার প্রদর্শনী, স্লাইড শো, ফিল্ম নিয়ে , নিজের অচল হাঁটু ও হাঁপানি নিয়ে সব জায়গায় ঘুরতে লাগলেন। আমাদের মার্কসবাদী জগতের বাইরে ভারতে বহু সুন্দর উদ্যোগ, যেমন অণুমুক্তি আন্দোলন— যারা বহু বছর ধরে পরমাণু চুল্লি ও ইউরেনিয়াম খনিগুলির কুকীর্তি, সে সর্ম্পকে পরমাণু বিজ্ঞানীদের মিথ্যা মিথ্যা আশ্বাস ও প্রচার, ওইসব এলাকার গ্রামের মানুষদের স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে গবেষণা ও প্রচার করছিল তাদের সঙ্গে বাংলার অনেকের যোগাযোগ গড়ে তুললেন। শ্যামলীদির পরমাণু প্রতিষ্ঠান বিরোধী বিদ্রোহ খুবই মূলগামী ছিল। আণবিক অস্ত্রের বিরোধিতা করতে করতে শ্যামলীদি চলে যেতেন সমস্ত যুদ্ধের বিরোধিতাতে, রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদের বিরোধিতায় (তা সে বুর্জোয়া হোক বা বিপ্লবী) সেখান থেকে বিরোধিতা নিয়ে যেতেন যে কোনো বল প্রয়োগের মাধ্যমে, আরোপণের মাধ্যমে নিজের মত অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে। আণবিক শক্তির বিরোধিতা থেকে উনি চলে যেতেন বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ওপর অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, চলে যেতেন 'প্রাচুর্যের' বা লাগামছাড়া ভোগের ফলাফল ও

Scanned by CamScanner

মূল্যবোধের বিরুদ্ধে। বোঝাতেন যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মূলধারা বশ্য দানব মোটেই নয়। বরং এই দানব আমাদের ঘাড়ে চেপেছে। তার পূজারি, পাণ্ডা, ও প্রচার দিয়ে সমাজে ক্ষমতা ও প্রাপ্তির লোভের আগুনের ঝড় তুলেছে। আমাদের মা বসুন্ধরার বিরুদ্ধে লুঠ-যুদ্ধ করে সকলকে ধ্বংসের সীমানায় নিয়ে এসেছে। তিনি বলতেন, সহজ-সরল সহযোগিতা, স্বাবলম্বিতা ভিত্তিক জীবন ছাড়া কোনো মুক্তি সম্ভব নয়। বলতেন, বাউল, ফকির, সাধারণ জীবনের অজস্র দৃশ্য-অদৃশ্য ধারার, যারা ওই লোভ-আরোপণের বিরোধিতা করে চলেছে।

৫

শ্যামলীদির উন্নয়ন বিরোধী বিদ্রোহ ও এই প্রতিরোধের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য

আগেই বলেছি, পারম্পরিক লেনিন-মাও-বাদী বামপন্থা পূর্ণ গোঁড়ামির সঙ্গে বিশ্বাস করত যে 'উন্নয়ন' (শিল্পায়ন, নগরায়ণ, সঞ্চয়ন, পণ্য বাজারের বিকাশ) হল 'প্রগতি' এবং এই হল মুক্তির ভিত্তি। অবশ্য তারা আরও মনে করত যে, "পুঁজিবাদী শ্রেণী এই কাজ করতেও পারবে না। আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর দল এটা ভালো পারবে এবং পুঁজিবাদীরা উন্নয়নের পথে আনবে বৈষম্য, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি হাজার সমস্যা। সাচ্চা বাম দল পারবে উন্নয়নের (ভালো প্রযুক্তির) মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করতে। পারবে সকলের জন্য প্রাচুর্য আনতে।" শ্যামলীদি ছিলেন এই উন্নয়ন-বাদের কট্টর বিরোধী। গ্রামাঞ্চলে নানা ধরনের জমি দখল করে হাউসিং, হাইওয়ে, নগরায়ণ— এ সবের উনি সবরকমভাবে প্রতিবাদ করতেন। জনা কয়েক বান্ধবী জুটিয়ে বা তা না পেলে একলাই ধরণায় বসে যেতেন। শ্যামলীদিকে ঘিরে বয়স্ক মহিলাদের একটা সুন্দর সখ্যতা ভিত্তিক গোষ্ঠী ছিল। 'বামপন্থীরা' এই সব প্রতিরোধে সাধারণত আসত না। শ্যামলীদির যখন হাঁটুর অবস্থা খুব খারাপ, তখনও দেখেছি বিশাল জমি দখল করে, কোপাই নদীর গলা ঠেসে অম্বুজাদের (দল ও রাষ্ট্রের সমর্থনে) দানবীয় হাউসিং প্রকল্পের বিরোধিতা করতে। শ্যামলীদিকে অনেকে দেখত শান্তিনিকেতনের নন্দিনী হিসেবে। পুলিশ, সরকার, উন্নয়ন-আমলাদের চোখে উনি ছিলেন ওখানকার মুখ্য ঝামেলা, *জঞ্জাল বা ঝঞ্ঝাট* (nuisance)।

অনেকে ভাবেন, পাকা সংগঠন ছাড়া প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অণু প্রতিরোধে লাভ কী? একি বাতুলতা নয়?

Scanned by CamScanner

শ্যামলীদির বোধ-দর্শনে আমাদের এই 'বসুন্ধরা'-র কোনো একটি ঘটনা প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে অসংখ্য অদৃশ্য (কখনো দৃশ্য) প্রভাবের সুতোয় যুক্ত। তাই প্রতিটি ঘটনা বা প্রবাহ সকলকে প্রভাবিত করছে আর নির্মাণ করছে আর নিজেও নতুন করে তৈরি হয়ে চলেছে। একটি প্রতিরোধ এই বসুন্ধরা নির্মাণ করলে তার প্রভাবের ধারাগুলো সব কিছুকে প্রভাবিত করবে। এই প্রতিরোধের ঘটনা যতই ছোটো হোক শোষণ-শাসনের সকল প্রবাহকে, আমাদের মনের মধ্যে তার মান্যতা-বশ্যতাকে দুর্বল করবে— যেমন করে ঘুণ পোকারা মহান দুর্গকে ফোঁপরা করে চলে।

এই প্রতিরোধ যদি 'নেতৃত্ব' বা কর্তানির্ভর আদলে হয় তাহলে তা কিছু কর্তৃত্ববাদী ধারা নির্মাণ করবে এবং বসুন্ধরার সকল ওই রকম ধারাদের সংযোগ ও শক্তি বাড়াবে। কর্তা নির্ভর ধারা-পরম্পরাগুলিইতো সকল প্রতিষ্ঠানের সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক জমিন। অন্যদিকে প্রতিরোধের ঘটনা যদি স্বনির্ভর, স্বাবলম্বী হয় যদি তা সমস্তরীয় বন্ধুত্ব-সহযোগিতা ভিত্তিক হয়, যদি তা অ-সম্প্রসারণবাদী, অনাগ্রাসী, দলবাদী ও দলবাজীর বিকল্প পথে হয় তাহলে তা বসুন্ধরায় ওই রকম সকল ধারাকে পুষ্টি দেবে। এটা সকল শোষণ-শাসনের সামাজিক-মানসিক বিকল্পের জমিনকে সমৃদ্ধ করবে। শ্যামলীদি তাঁর জীবনচর্যা দিয়ে এই সব কথাই বলে চলেছেন। শ্যামলীদির ধারা আর আমাদের ধারাগুলি বহু সঙ্গম নির্মাণ করে চলেছে।

শ্যামলীদির উন্নয়ন বিরোধী বিদ্রোহের সঙ্গেই থাকত বিকল্প নির্মাণের মাধ্যমে প্রতিরোধ

ঢাক ঢোল বাজিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে বিকল্প কর্মকাণ্ড, শ্যামলীদির বোধে আমূল বিকল্প নয়। এতে বিকল্পের সঙ্গে প্রতিষ্ঠান অনেকটাই তৈরি হচ্ছে। ওঁর যাত্রা তাই অনেকটা আলাদা ছিল। সঞ্চয়ন-উচ্চাকাঙ্ক্ষার ইঁদুর দৌড়ের বিপরীতে পারস্পরিক সহযোগিতা-স্বয়ং সম্পূর্ণতা, জীবাশ্ম শক্তি ও কারখানার বাইরে উৎপাদন ও তার আদান প্রদান— গ্রামীণ জীবনে এই সব অজস্র ধারা, সেখানকার শিল্পী-কারিগরদের পরম্পরাগুলি দেখা, তাদের শ্রদ্ধা জানানো ও উৎসাহিত করা শ্যামলীদির প্যাশন ছিল।

ওই অসুস্থ অবস্থাতেও শ্যামলীদি অনেক উদ্যোগী বন্ধুদের সঙ্গে মিলে গড়তে সাহায্য করেছিলেন কোপাই নদী পেরিয়ে শনিবারের হাট। এখানে আমরা মিলিয়ে দেখতে পারি

Scanned by CamScanner

'৭০ - এর দশকে কানাডার 'ভ্যাঙ্কুভার' শহরে হ্যাঙ্গারের মধ্যে সমাজ গড়ার ধারা (বিস্ফোরণের মাঝখানে, পৃষ্ঠা ২৩)। অনেক গ্রামীণ শিল্পী-কারিগর এখানে হাটে তাদের সৃষ্টি দেখাত। সমঝদারেরা দূরের কলকাতা থেকেও এখানে দেখতে, মিলতে, কিনতে আসত। এখানে একটা চমৎকার স্নিগ্ধ অবাজারি, মেলার মতন, আন্তরিক পরিবেশ নির্মিত হত। বিজলি নেই, মাইক-বিজ্ঞাপন নেই। প্রচুর মেলামেশা, আলাপ, বাউল গান।

সংস্কৃতি, আনন্দ-উৎসব, ধার্মিক জীবন জগতের মধ্যে প্রতিরোধ ও বিকল্প

বাউল-ফকির মেলা, তাদের অ-প্রাতিষ্ঠানিক জীবনচর্যা— এ সবের সঙ্গে শ্যামলীদি খুবই যুক্ত থাকতেন। এই ক্ষেত্রগুলিতে মঙ্গল-মুক্তি ধারাগুলিকে উনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের তুলনায় কম দামি মনে করতেন না। এসবের মধ্যে উনি বিদ্রোহ ও বিকল্প সমাজ নির্মাণের অজস্রধারা (আবার বাজার-প্রতিষ্ঠানবাদের শক্তিশালী ধারাও) দেখতেন। অনেক বার বলতেন, 'তোমরা যেমন প্রশ্নগুলো জানতে চাইছো তার জন্য অমুক বাউলের কাছে যাও'। উনি বাউলদের জগৎ, মেলার জগৎ, তার মধ্যে অজস্র সুন্দর-অসুন্দর ধারার খেলা— কত বুঝতেন, কত কিছু করতেন।

শ্যামলীদি বিশ্বাস করতেন যে মানুষের প্রাত্যহিক জীবন, আনন্দ, দুঃখ, ভয় ও সকল অনিশ্চয়তার সঙ্গে সম্পর্কিত হবার রীতি রেওয়াজ, ব্যক্তিগত ও যৌথ (পারিবারিক, ধার্মিক) জীবনচর্যার ধারা তার প্রকৃতি জগতের সঙ্গে সম্পর্ক, মূল্যবোধ— এ সব ক্ষেত্রগুলিকে নানান প্রতিষ্ঠান (জাতিবর্ণ প্রথা, পিতৃতন্ত্র, ব্রাহ্মণ্যবাদ, কৌম সমাজ, রাষ্ট্র, সংগঠিত ধর্ম) দখল করে চলেছে। এ সবই শাসন-শোষণ ব্যবস্থাগুলির এক প্রধান ভিত্তি। আবার এইসব ক্ষেত্রগুলিতে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, পারস্পরিক সহানুভূতি ও বিকল্প নির্মাণের অজস্র ধারা প্রবাহ ও ঐতিহ্য পাওয়া যাবে। এই মঙ্গল-মুক্তিকামী প্রবাহগুলি বয়ে চলেছে সুফি-ভক্তি, বাউল, নিম্ন বর্ণের বিদ্রোহ ও করুণার অজস্র আত্মিকতা-ধর্ম পরম্পরার মধ্যে; রবীন্দ্র, মানব ধর্ম, গান্ধি ও এই ধরনের অজস্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে।

বাম পরম্পরা এ ব্যাপারে অন্ধ থেকেছে। শ্যামলীদি বুঝতেন যে এই বিষয়গুলি মঙ্গল-মুক্তি-র জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ।

Scanned by CamScanner

ব্যক্তিগত জীবনচর্যা দিয়ে প্রবাহিত সহমর্মিতা, সহযোগিতা অদ্রোহ ও বিদ্রোহের ধারাসমূহ

ব্যক্তিগত জীবন, জীবনচর্যার ক্ষেত্র দিয়ে বইছে একদিকে বশ্যতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রতিষ্ঠানবাদীতার আর অন্যদিকে করুণা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, স্বাবলম্বিতা ও বিদ্রোহের অজস্র ধারা। কোন ধারাগুলির সঙ্গে যুক্ত হব, কোন ধারাগুলি থেকে নিজেদের হটাবার চেষ্টা করব— এটা ছিল শ্যামলীদির রোজকার প্রতি মুহূর্তের জীবনচর্যার বিষয়।

আমাদের দেশে সমাজ মঙ্গলের মুক্তির জগৎ দুই বিবদমান শিবিরে বিভাজিত ছিল। এক শিবির মনে করত বিকল্প জীবন ও সমাজ নির্মাণে অন্তর পরিবর্তনের যাত্রাটাই প্রধান। এরা আত্মিকতা, ধার্মিকতা, মূল্যবোধ, অন্তর-মন্থন, সাধনা, শিক্ষা, উৎপাদন বন্টন ব্যবস্থা, স্ব-শাসন এ সব ক্ষেত্রে বিকল্প নির্মাণের ওপর জোর দিত। গান্ধি-রবীন্দ্রনাথ-এর চিহ্ন এই শিবিরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অন্যদিকে এর বিরোধী 'বাম' শিবিরের মতে বাইরের সমাজ, তার অর্থনৈতিক কাঠামোটাই সমস্ত সমস্যার প্রধান জনক ও তাকে পাল্টানোটাই মুক্তির আসল শর্ত। সেটা না করলে অন্তর পরিবর্তন বা কোনো বিকল্প নির্মাণ বেশি দূর করাই যাবে না। কারণ ওই বৈষয়িক আর্থিক কাঠামোটাই আমাদের অন্তর ও জীবনচর্যার মুখ্য নির্মাতা। ওই দুই শিবিরের বৈরিতা ও যুদ্ধে তাদের মাঝামাঝি বা বাইরে দাঁড়ানো খুবই কঠিন ছিল। তৃতীয় অবস্থান দেখাই যেত না। শ্যামলীদি কিন্তু এর এক দৃশ্যমান ব্যতিক্রম। শোষণ-শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর সহমর্মিতার মূল্যবোধ ও বিকল্পের নির্মাণ, বাইরের ও ভিতরের জগতে পরিবর্তন— এই দুইয়ের সঙ্গম— এই দুই পায়ে চলাই ছিল শ্যামলীদির যাত্রা। নিজের জীবনচর্যার ক্ষেত্রে এই দুইয়ের সমন্বয়, মূল্যবোধের এত-একনিষ্ঠ যাত্রা শ্যামলীদির ক্ষেত্রে দর্শনীয় ছিল। এত নিবিড় একনিষ্ঠতার নির্মাণ কীভাবে হল তা আমরা জানি না। এর কিছু ঝলক দেখা যায় শ্যামলীদির লেখায় ওঁর বাবার বইয়ের মুখবন্ধে (যা আমরা আগেই কিছুটা বলেছি)। উনি 'বসুন্ধরা'কে ও তার অঙ্গ মানবসমাজকে নিজের মধ্যে গভীর ভাবে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত করেছিলেন। মুনাফাবাদী ব্যবস্থার আক্রমণে দীর্ণ বসুন্ধরাকে রক্ষা করার আর্তি শ্যামলীদির এত গভীর ছিল যে এই পথে বিদ্রোহ, সংবেদনশীলতা আর বিকল্প নির্মাণের উপযোগী মূল্যবোধ ওঁর মধ্যে প্রোথিত হয়ে গেছিল।

ওঁর মতো সমাজে স্বীকৃত ও গুণের অধিকারী, আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে ও দেশে ব্যাপক পরিচিতি ও সুনাম, টাকার এত উৎসের সাথে সম্পর্ক খুব কম জনেরই

Scanned by CamScanner

থাকে। এই অবস্থায় শ্যামলীদির পক্ষে নামে দামে ক্ষমতার একেবারে নিচে, মাটির কাছে থাকাটা কত কঠিন সংগ্রামই না ছিল। অথচ এই অনুচ্চাকাঙ্ক্ষী যাত্রা শ্যামলীদি কত সহজে করতেন। আর্থিক কষ্ট উনি কত সহজভাবে মানিয়ে নিয়েছিলেন। মোবাইল নিয়েছেন বাধ্য হয়ে, হাঁটুর কঠিন ব্যথাতেও গাড়ি নেননি, রিক্সাতে সব জায়গায় গেছেন। এত বন্ধু ওঁর আতিথেয়তা নিতে আসত যে শ্যামলীদির ব্যক্তিগত ক্ষেত্র খুব দমবন্ধ নিশ্চয়ই হয়ে উঠত।

টাকার বাজারের বিরুদ্ধে ওঁর স্নিগ্ধ সংগ্রামের একটা অভিজ্ঞতা

এক নতুন খোলা MNC Bank-এর manager শ্যামলীদির বাড়ি ছুটে এসেছেন। বলেছেন, "আপনাকে একটা ছোটো অ্যাকাউন্ট আমাদের ব্যাঙ্কে খুলতেই হবে। সবাই বলছে যে তাহলে আমরা শান্তিনিকেতনের শ্রদ্ধা ও আস্থা পাব।" শ্যামলীদি ওঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলছেন টাকার সঞ্চয় ও বিনিয়োগের কথা, ব্যাঙ্ক ও ফাটকাবাজির ভয়ঙ্করতার কথা। ওঁর নম্রতা দেখে ম্যানেজার ছেলেটি কিছুতেই ছাড়বেন না। প্রায় এক ঘন্টা ধরে দুজনেই গলদঘর্ম হলেন।

৬

মঙ্গল-মুক্তির জগতের মধ্যে সকল ক্ষমতা-দূষণ বিরোধিতার পথে শ্যামলীদির সব ধরনের মতাদর্শ ও গোষ্ঠিকেন্দ্রিকতা বর্জন

আমরা অনেক সময় মঙ্গল মুক্তির ভালো কাজ করতে এত নিবিষ্ট হয়ে পড়ি যে সেই ভালো লক্ষ্যের জন্য "যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতা বাড়ানো, মানুষ জোগাড় করা ও তাদের ব্যবহার করা, প্রতিযোগিতা, অ-নৈতিক কৌশল, যুদ্ধের মতন পদ্ধতি ব্যবহার করতে থাকি। আমরা যত ক্ষমতাবান হব, আমাদের ভালো কাজও তো তত বড়ো হবে।" এই বিশ্বাসের পথে আমরা ক্রমাগত প্রতিষ্ঠানে লীন হতে থাকি। অথবা সংকীর্ণতাবাদের কাদায় হাবুডুবু খেতে থাকি। এগুলি মহামারির মতন আমাদের মঙ্গল মুক্তির জগতকে আচ্ছন্ন করে। একে আমরা এক কথায় 'ক্ষমতা দূষণ' বলছি।

পুঁজির লোভ-প্রতিযোগিতা, দখলদারী অথবা সকল শাসন প্রতিষ্ঠানের (রাষ্ট্র বা সমাজ বা দল বা ধর্মীয়) কর্তৃত্ববাদের কট্টর বিরোধী তো শ্যামলীদি ছিলেনই। শ্যামলীদি মনে করতেন যে এই উঁচু-নিচুবাদী প্রবাহগুলো শুধু 'প্রতিষ্ঠান' গুলি তৈরি করে না। আমরা

Scanned by CamScanner

আমাদের জীবনচর্যা দিয়ে প্রতি মুহূর্তে ওগুলি নির্মাণ করি, মুরুব্বিয়ানা, দাদাগিরি ও নিয়ন্ত্রণের সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক জমিন তৈরি করি।

এটাও ওঁর কাছে স্পষ্ট ছিল যে ক্ষমতার ওই বিষ-হাওয়া বা ভাইরাস মুক্তিকামী জগতেও নির্মিত হচ্ছে। অবশ্যই এখানে তারা দাপিয়ে বেড়ায় মুক্তির আদর্শে বিশ্বাস-এর নামাবলি গায়ে দিয়ে। এটাই বড়ো সমস্যা। ক্ষমতা-দূষণের ভাইরাসরা অবচেতন মনে বাসা বাঁধে। গুপ্তচর ঢুকিয়ে দেয় 'সচেতন মনের' গভীরে। যেখানে তারা আমাদের যুক্তির প্রখরতা, বিদ্রোহের প্যাশনগুলি ব্যবহার করে নিজেদের দূষণের স্বার্থে। এদের মোকাবিলা করার জন্য শ্যামলীদির ওষুধগুলো দেখা যাক।

'তুমি যদি পুঁজির জগতে মুনাফা, সম্পত্তি বাড়ানোর ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতিযোগিতার প্রথার বিরুদ্ধে হও তাহলে মুক্তির দুনিয়াতেও এই মূল্যবোধকে বর্জন করো।' 'তুমি যদি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ববাদ, অনুগামিতাবাদ, আরোপণবাদ, মানুষকে নিজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা (সামাজিক প্রযুক্তিবাদ)— এ সবের বিরুদ্ধে হও তাহলে মুক্তির প্রকল্পের জগতে, নিজের জীবনচর্যার জগতে এসবের বিরুদ্ধে সক্রিয় হও।' শ্যামলীদির আচরণের নীতি ছিল, "আমার যা মঙ্গল-মুক্তিকামী মনে হয় আমি তা নিজে করব। তোমাকে নিশ্চয় তা বলব, সংলাপ চালাব। তোমার যদি এরকম মনে হয় তুমি তা করবে, সহযোগিতা হবে।" ব্যাস, আমি যা সঠিক মনে করি তা তত্ত্ব, যুক্তির জালে বেঁধে তোমাকে আমার পথে আনব, ছলে, বলে, কৌশলে, প্রভাব-ভালবাসা বা অন্য কোনো ভাবে সঠিক চিন্তা ছড়িয়ে দেব— এই সব পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন উনি। এই বিরোধিতা ওঁর দরদ, বিদ্রোহ ও বিকল্প নির্মাণের একেবারে মর্মে ছিল।

আমরা কিছু বন্ধু অনেক বছর যাবৎ শোষিত মুক্তিকামী দুনিয়ার ক্ষমতা দূষণ-প্রক্রিয়াগুলি অধ্যয়ন, বর্ণনা ও উৎসাহীদের মধ্যে যোগাযোগ ও আলোচনার কাজে আগ্রহী ছিলাম। এ ব্যাপারে শ্যামলীদির সহযোগিতা চাইতাম। উনি এ ব্যাপারে অনেক সময়ই নীরব থাকতেন। আমরা বেশি কথা বললে উনি অস্বস্তি বোধ করতেন। মন্ত্রের মতন আওড়াতেন- 'বেশি তত্ত্ব মানেই মতাদর্শের খাঁচা, গোষ্ঠীবাদ'। আমরা বলতাম, "এটা ঠিক যে আমরা ক্রমাগত তত্ত্ব ও মতাদর্শ কেন্দ্রিকতার গর্তে পরে ভয়াবহ সংকীর্ণতাবাদ, Paranoia- র আগুন লাগিয়েছি। তাই বলে কি আমরা ঘর পোড়া গরুর মতন হব? বাংলায় মতান্তর থেকে মনান্তর ঘরে ঘরে। তাই জন্য কি এসব সমস্যা নিয়ে সংলাপ গড়ে তোলার দরকার নেই?" শ্যামলীদি কিন্তু উৎসাহ দেখাতেন কম। উনি ওঁর 'জীবনচর্যা'

Scanned by CamScanner

ও কর্মের ভাষায় এসব কথা বলে চলতেন। মতান্তর সত্ত্বেও মনের মিল গড়া, যতটুকু পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সহযোগিতা নির্মাণ করা যায় তা করার কাজ নীরবে চালিয়ে যেতেন।

বাংলায় তত্ত্ব/মতবাদ কেন্দ্রিকতার মহামারি ও তাতে বারবার আঘাত পাওয়া নিশ্চয় শ্যামলীদি এই অভ্যাস তৈরি করত। তাছাড়া ওঁর তো গভীর অভ্যাস ছিল নিজের অবস্থানগুলো হাল্কা করে, ভারী তত্ত্বের ভাষায় না বলা। তা আচরণ, জীবনচর্যার ভাষায় বলা। ওঁর এই যাত্রা আমাদের কাছে খুব দামি শিক্ষা ছিল। তাছাড়া, মঙ্গল-মুক্তির জগতে ক্ষমতা দূষণ, তত্ত্ব-কেন্দ্রিকতার বাইরে সংলাপ, সহানুভূতি, সহযোগিতা গড়ে তোলার জন্য ওঁর অভিযান আমাদের প্রচেষ্টার থেকে অনেক বেশি সু-প্রভাব ছড়াত। বহুজনের মনে উনি মঙ্গল-মুক্তির তীব্র ধারাগুলি, স্নিগ্ধ সংবেদনশীলতার তরঙ্গগুলি, ক্ষমতা দূষণ না বাড়িয়ে কী করে অনেক ভালো কাজ করা যায় এই ধারাগুলি ছড়িয়ে দিতেন। তা অনেকটা না-বলা, অ-ভাষি হলেও আমাদের মর্মে ঢুকে পড়ত। তা তত্ত্বের স্তরে না হলেও আমাদের তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কটাই বদলাতে সাহায্য করত। উনি ওঁর উদ্ভিদ, প্রাণী জগৎ, 'সাধারণ' মানুষের জগৎ, 'বসুন্ধরা' থেকে নিশ্চয় এই যাত্রার বোধ ও শক্তি পেতেন। মন ও সমাজ-সমুদ্রে শ্যামলীদির এই প্রবাহগুলি বইতেই থাকবে। আমাদের অন্তরে ও চেতনায় কাজ করতেই থাকবে, আক্রান্ত বসুন্ধরার সঙ্গে সম্পর্ক বদলাতেই থাকবে, আজকে বা কালকে। আমরা সকলে একটু বেশি শ্যামলীদি হয়ে উঠব।

৭

শ্যামলীদির মূল্যবোধ, দর্শন আত্মিকতা ও ধর্মবোধ কেমন ছিল

এত ভালোবাসা ছিল ওর মধ্যে, এত টান এত মায়া। মায়া সারা জীবজগতের প্রতি। সৃষ্টির প্রতিটি কণা ছিল তার কাছে মূল্যবান। ধরিত্রীকে সুস্থ রাখা, তাকে অকলঙ্ক রাখা, তাকে দীর্ঘায়ু রাখা সে তার নিজের দায়িত্ব বলে ধরে নিয়েছিল।... শ্যামলী সব জায়গায় দুর্বলদের কাজে লাগার সুযোগ খুঁজে নিত।...

... বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি তার জন্য নয়। বাগানের গাছপালাগুলোও তার আদর পেত। আর বিশ্বশুদ্ধ মানুষের কল্যাণের জন্য... সে নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ মনে করত।... শ্যামলী শিখেছিল খুনের অস্ত্র জোগান দেওয়া-ব্যাবসা বিরোধী হতে।... তার জীবনের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কটিও সে স্বেচ্ছায় ছেড়ে (দেয়) শুধুমাত্র স্বামীর কর্মস্থল, যুদ্ধাস্ত্র তৈরির কারখানায়, উচ্চপদে কাজ করার নৈতিকতা নিয়ে আদর্শগত বিরোধের জন্য।

Scanned by CamScanner

শ্যামলী ছিল সত্যি অর্থে শান্তির সাধক। (শান্তির সৈনিক কথাটা কি বিচ্ছিরি না।) সেই সাধনার জন্যে, অনেকখানি ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিল সে, কেননা জগতের শান্তি, আর মানুষের কল্যাণ ছিল তার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে প্রার্থনার বস্তু।"

(নবনীতা দেব সেনের লেখো থেকে।)

...আর একটা জায়গায় ইতিমধ্যে যেতে শুরু করেছি (Canada-তে) তা হল ইউনিটেরিয়ান চার্চ। রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ইউনিটেরিয়ানদের যোগসূত্রের ইতিহাস কিছুটা জানতাম। ভ্যাঙ্কুভারে থাকতে শুরু করার প্রথম দিনের সার্ভিসেই রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে পাঠ হওয়ায় ভালো লেগেছিল। পরের দিনও গেলাম— নিউক্লিয়ার ডায়লগ্‌স— একজন তার অভিজ্ঞতার কথা বলছে, কোনো প্রার্থনা নেই, সারমন নেই। পিয়ানো ছিল, গান হল, তারপর চার্চের এক ভদ্রলোক ফিল্ম দেখালেন। তিনি ফিল্ম দেখিয়ে বেড়াতেন, নানান দেশের বিবিধ সমস্যার ছবি, চেষ্টা করতেন দর্শকদের মধ্যে থেকে যেন প্রশ্ন ওঠে, সক্রিয়তার কথা বলতেন। সেখানেও আমার অনেক প্রশ্নর সঙ্গত উত্তর মিলল।

(শ্যামলীদি— 'বিস্ফোরণের মাঝখানে'-বিরোধিতার জীবনভাষ্য, পৃষ্ঠা ২৪)

এই অংশটা অনেকটা ফাঁকা রাখতে হচ্ছে। কারণ এ বিষয়ে আমরা খুব কম জানি। আমাদের আবেদন রইল, এ ব্যাপারে যারা কিছু হলেও জানে, তাদের জানাগুলো একত্র করা। তাই যা বলার তার মধ্যে কোথাও কোথাও আমাদের কল্পনা ও অনুমান অনেকটা থাকছে।

শ্যামলীদির লেখাতে ধর্ম নিয়ে কথা কেন এত কম এসেছে? উনি বড়ো সাংগঠনিক ধর্মগুলি দল বা গোষ্ঠীভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ-বন্ধন, আমরা-ওরা নির্মাণ, সম্প্রসারণের নীতি— এগুলির বিরোধী ছিলেন। ওঁর ভাষায় উনি সেই ধর্ম ও তাদের সাম্প্রদায়িকতার জোরালো বিরোধিতা করতেন। তাই শ্যামলীদির ধর্মের যাত্রা ছিল ব্যক্তিগত। উনি গুরুত্ব দিয়ে অনেক ধর্মের উল্লেখ করেছেন, "ইউনিটেরিয়ান, কোয়েকার বা ফ্রেন্ডস, বেশ কিছু গতিশীল ক্যাথলিক ও বৌদ্ধ ভিক্ষু, আদিবাসী ধর্ম। এরা প্রার্থনা করে না। এরা "শান্তির কথা, পরিবেশ রক্ষার কথা মনে করিয়ে জীবন যাত্রা বাহুল্যহীন করার প্রচেষ্টা ও অহিংস আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।" (বি. মা., পৃষ্ঠা ১৪)

ওঁর ধর্ম যাত্রা ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া। বাইরে সমমতের ধারা ও ব্যক্তিদের থেকে শেখা। নিজের ধর্ম তৈরি করতে করতে যাত্রা করা। অবশ্যই তা অন্যের ওপর

Scanned by CamScanner

আরোপণ না করা। দেখাই যাচ্ছে যে শ্যামলীদি পূবের (সুফি, ভক্তি, বৌদ্ধ, বাউল, রবীন্দ্রনাথ ও মানব ধর্ম) আর পশ্চিমের বহু বিদ্রোহী ধার্মিক ধারা থেকে ক্রমাগত শিখেছেন। শ্যামলীদির ধর্ম-দর্শন মূল্যবোধের মর্মে ছিল 'বসুন্ধরা'-র ধারণা। এই 'বসুন্ধরা' পুরোনো (নিউটনের যুগের) বিজ্ঞানের চোখে দেখা কোনো 'জড় পৃথিবী' নয়। এই 'বসুন্ধরা' হল প্রাণময় সামগ্রিকতার এক মহা-বাস্তুতন্ত্র। এখানে বায়ুমণ্ডল অথবা মৃত্তিকা আর প্রাণীতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্কটা দেখুন। তারা উভয়ে একে অন্যকে প্রভাবিত ও নির্মাণ করে চলেছে বা আমরা বলতে পারি যে অজস্র প্রভাবের ধারা এই 'বসুন্ধরা' (ও মানব সমাজ)-এর মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। 'বসুন্ধরার' প্রতিটি অংশ অন্য সকল অংশকে প্রভাবিত করছে ও নির্মাণ করছে।

*"শিল্প শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ হবার শিক্ষা, প্রকৃতিকে দেখতে **ও আমরা যে প্রকৃতিরই অংশ বিশেষ সেটা উপলব্ধি করতে শেখা**— এসব বাবার কাছ থেকেই আমার মনে গেঁথে গেছে"* ('আমার এ পথ' বইয়ে শ্যামলীদির লেখা মুখবন্ধ)। শিল্প সাধনা, ছোটোবেলা থেকে শ্যামলীদিকে বসুন্ধরার সঙ্গে একাত্ম হবার পথ দেখিয়ে দিল।

বড়ো হয়ে, নবনীতাদির ভাষায় 'শান্তি সাধনা' একই পথে শ্যামলীদিকে টেনে নেয়।

শ্যামলীদির 'বসুন্ধরা' ধারণা সম্বন্ধে কিছু কথা

শ্যামলীদির বসুন্ধরাতে মানব ও প্রকৃতির ভূমিকা:

বেশির ভাগ সংগঠিত ধর্ম মনে করে যে বিশ্বে মানব জাতিই কেন্দ্রীয়। কারণ 'মানব' ঈশ্বরের সর্বোচ্চ সৃষ্টি। বামপন্থী মতাদর্শেও মানুষকে মনে করা হয় প্রকৃতির রাজা। কারণ তারই আছে 'চেতনা'। এই সকল পরম্পরায় প্রকৃতি হল মানুষের ব্যবহার, ভোগ দখলের জন্য উৎসর্গীকৃত। মানব অধিকারের কথা আমরা বলি। প্রকৃতির কোন অধিকার নেই। এদের 'মানব কেন্দ্রিক' পরম্পরা বলা হয়।

অন্যদিকে আছে এর বিরোধী, বিপরীত পরম্পরা। প্রকৃতির ও তার অসংখ্য প্রাণী প্রজাতির ওপর বল্গাহীন অত্যাচার, লুঠ ও ধ্বংসে এরা খুবই ক্ষুব্ধ। এরা মনে করে যে বিশাল প্রকৃতির প্রয়োজন সবথেকে দামি। মানুষের প্রয়োজন বা সমস্যা দ্বিতীয় স্তরে। 'গভীর বাস্তুতন্ত্র আন্দোলন' (Deep Ecology) ইত্যাদি বিভিন্ন নামে '৬০-এর দশক থেকে এসব ধারণা প্রকাশ্যে এসেছে।

Scanned by CamScanner

শ্যামলীদির 'বসুন্ধরাবোধ' এই দ্বিমেরুকরণের বাইরে। ওঁর 'বসুন্ধরা'য় মানুষ ও প্রাণী-প্রকৃতি জগৎ অঙ্গাঙ্গী ভাবে একে অন্যকে নির্মাণ করে। তাদের ওরকম প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে ভাগ করা যাবেনা। তাছাড়া, উনি বিশ্বাস করতেন যে মানব সমাজে শোষণ, বৈষম্য, ক্ষমতা ও মুনাফার সঞ্চয়ন, তার লোভের উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছাড়া বসুন্ধরাকে বাঁচানো যাবে না। আমরা যতই গাছ লাগাই বা 'সবুজ প্রযুক্তি' আনি তাতে কিছুই করা যাবে না।

অনেকে ধর্ম বলতে বোঝেন এমন এক বিশ্বাস-গুচ্ছ যা আমাদের জীবনের অর্থ, জীবনের সঙ্গে সমস্ত জগতের সম্পর্ক-বোধ, আমাদের জীবনের দিশা ও চালিকা শক্তি দেয়। তাহলে শ্যামলীদির ধর্ম কী করে সমাজ নিরপেক্ষ হবে? সমস্ত বৈষম্য, প্রতিষ্ঠান— তা রাষ্ট্র, পুঁজির হোক অথবা সংগঠিত ধর্মেরই হোক বা আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী 'ভদ্রলোক' সমাজই হোক— তার বিরোধিতা, বিকল্প যাত্রা ছিল শ্যামলীদির সাধনা যাত্রার মর্ম, শ্যামলীদি ওঁর ধর্ম-যাত্রা এমন ভাবে নির্মাণ করতেন যাতে তা আমাদের ভালোবাসা, বিদ্রোহ, বিকল্প জীবনচর্যাকে অর্থ, শক্তি ও পূর্ণতা দেয়।

প্রচলিত ধর্মগুলির 'ঈশ্বর' আর শ্যামলীদির 'বসুন্ধরা' পাশাপাশি রেখে দেখা যাক

'বসুন্ধরা'র অনেক কিছুই অসীম হলেও তা ঈশ্বরের মতন অসীম শক্তি বা চেতনাধর নয়। আজ বসুন্ধরার এক অংশ, তার ভোগবাদ, সম্প্রসারণ ও সঞ্চয়নের ধারাগুলি ক্যান্সারের মহামারীর মতো 'বসুন্ধরা'-কে ক্ষতবিক্ষত করে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। 'অবতার' সিনেমাতে দেখেছি দূর গ্রহের এক 'বসুন্ধরা'-তে মানুষ সাম্রাজ্যবাদী লুঠ-হামলা চালাচ্ছে। শেষমেষ সেই বসুন্ধরা তার সমস্ত প্রাণী জগৎ দিয়ে ওই লুঠেরাদের চটপট পরাস্ত করল। শ্যামলীদির 'বসুন্ধরা'র কিন্তু এমন কোনো শক্তি নেই যে সে নিজেকে রক্ষা করবে, ঈশ্বরের মতো তা শত্রুদের নিমেষে ভস্ম করে দেবে। 'বসুন্ধরা' বেশ অসহায়। হ্যাঁ, সে প্রতিরোধ করছে নানাভাবে। তার আর্তনাদ শুনে অজস্র ধারা ওই মহামারির বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। শ্যামলীদির মতো। কী হবে সেটা কিন্তু বলা যাবেনা।

তাহলে শ্যামলীদির দর্শন-ধর্মে 'সৃষ্টিকর্তা' আর 'বসুন্ধরার সম্পর্ক কীরকমের

শ্যামলীদি হয়তো 'সৃষ্টিকর্তা' আর 'বসুন্ধরা' কে একেবারে এক করে দেখতেন না। কিন্তু তাই দাঁড়াচ্ছে অনেকটা। বসুন্ধরার উপরে স্থিত সৃষ্টিকর্তাকে প্রার্থনা শ্যামলীদি মনে হয় পছন্দ করতেন না। ওঁর সকল লেনদেন তো ছিল 'বসুন্ধরা'র সঙ্গে। ওঁর সাধনা, প্রার্থনা

Scanned by CamScanner

যা দেখা যায় তা তো ছিল বসুন্ধরার সঙ্গে একাত্ম হবার, তাকে ভালোবাসা ও বোঝার, তাকে রক্ষা করবার জন্য। মনে হয় 'বসুন্ধরা' ই ছিল শ্যামলীদির ঈশ্বরের বেশির ভাগটা। এই ধর্ম অবস্থান অনেকটাই ছিল পুরোনো ঈশ্বরবাদ-নিরীশ্বরবাদের বা ধার্মিক-অধার্মিক বিভাজনের ঝগড়ার বাইরে। ঈশ্বরবাদের বাইরে বলছি কী অর্থে? কোনো সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিশালী ওপরওয়ালা আছেন, তাঁরই নিয়ন্ত্রণে আছি বসুন্ধরা ও আমরা ও তাকে সাধনা করেই আমরা জীবনে অর্থ দিশা বুঝব— এই বিশ্বাস কে ঈশ্বরবাদ বলা যায়। একে উপর-নিচু-বাদী ধর্মের ঘরানা বলা হয়। শ্যামলীদির এরকম বিশ্বাস ছিল না মনে হয়।

শ্যামলীদির 'বসুন্ধরা' কিন্তু যেমন বললাম, আমাদেরই মতন অজস্র প্রাণী, প্রাণ প্রবাহ ও বস্তু প্রবাহ, তাদের যৌথতা দিয়ে, তাদের সামগ্রিকতা দিয়ে নির্মিত। একে ঈশ্বর বললে এর অর্থটা বদলায় না। একে আমরা 'ওপরওলা কেন্দ্রিক নয়' এমন ঘরানার দর্শন বা ধর্মবোধ বলি। এখানে ওরকম এক চূড়ান্ত সর্বশক্তিশালী কর্তা নেই। তার পূজারি-পুরোহিতদের কর্তৃত্ব ও অনুশাসন তাই নেই। নেই কোনো চূড়ান্ত ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক উঁচু-নিচুবাদী সিঁড়ি। এখানে সবাই সমতলে, সমস্তরে, এক 'বসুন্ধরা'র শরীরে আছি। এই রকম 'বসুন্ধরা'কেই ঈশ্বর বলে ভাবা যেখানে কোনো সর্বশক্তিমান ওপরওলা নেই। এর অনেক সুবিধা আছে। প্রথমত আপনি এই ঈশ্বরকে যাই বলুন, 'বসুন্ধরা' তো একই। তার মানে এই ঈশ্বর, সেই ঈশ্বর- এ ভাগাভাগির কলহ করা যাবে না। আবার নিরীশ্বরবাদ, বস্তুবাদ ঈশ্বরবাদের ঝগড়া ও ভিত্তি ভেঙে যাচ্ছে। কারণ 'বসুন্ধরা' তো কারুর কল্পনাপ্রসূত নয়। সে তো 'যা আছে' তাই— এই রকম চিন্তা সকল ঈশ্বর ভিত্তিক অথবা ঈশ্বর-নিরীশ্বর ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক, বিভাজনের ভিত্তিকে সাবোটাজ করছে।

অন্যদিকে, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত অথবা তাত্ত্বিক নেতাদের শক্তি অনেকটা আসে ওই সর্বশক্তিশালী পিতার মডেল থেকে। আসলে আমরা আমাদের কর্তৃত্ববাদী প্রয়োজনগুলির সংস্কৃতি-মানসিকতা-অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্যই ওই সর্বশক্তিশালী ওপরওয়ালার মডেল বানাই। আবার নিরীশ্বরবাদীরা মানে বিজ্ঞান-মতাদর্শ বলে একটা কিছু আছে যা দিয়ে আমরা সর্বজ্ঞ বা নিদেন পক্ষে উচ্চতম জ্ঞানের অধিকারী হতে পারি। এই মডেলে তাত্ত্বিক নেতাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার যুক্তি-জমি তৈরি হয়। রহস্যময় বহু অদৃশ্য-দৃশ্য ধারায় বসুন্ধরাকে আলোকিত করবার কোনো মহান তত্ত্ব নেই। বসুন্ধরায় অনেক কিছু তো আমরা বোধ করতে পারি আমাদের অনুভূতি দিয়ে। তাই এই বসুন্ধরা মডেলে বিজ্ঞানবাদী

Scanned by CamScanner

কর্তৃত্ববাদও ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে। এরকম ধর্মের ঘরানা সকল সংগঠিত ধর্মের বাইরে, বিকল্প সমানতার বিদ্রোহগুলির মাধ্যমে প্রবাহিত হত—এশিয়াতে বৌদ্ধ, সুফি, ভক্তি, বাউল 'মানবধর্মের', অজস্র ঘরানার মধ্য দিয়ে; পশ্চিমে শ্যামলীদি যেমন বলেছেন, ইউনিটিরিয়ান চার্চ, কোয়েকার, মুক্তিকামী খ্রিস্টিয় ও অন্য অজস্র ধারার মধ্যে; দর্শনে Spinoza থেকে '৬০-এর দশকের বিদ্রোহী আত্মিকতার প্রবাহগুলি, যেমন হিপি, মূলগামী পরিবেশ (বাস্তুতন্ত্র) আন্দোলন, উত্তর-কাঠামোবাদী (post-structuralist) দার্শনিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

৮

শেষ কথা

এখানে দেওয়া শ্যামলীদির বর্ণনাটা নিশ্চয়ই 'আমাদের শ্যামলীদি'র, আমাদের চশমা দিয়ে শ্যামলীদিকে দেখা। যে কেউ নিজের চশমা পরে শ্যামলীদিকে দেখতে পারেন বা দেখবেন। আমাদের উদ্দেশ্য 'শ্যামলী আসলে কেমন ছিলেন' তার কোনো বাস্তবোচিত, প্রামাণ্য-তথ্য-ভিত্তিক, নিরপেক্ষ দলিল পেশ করা নয়। তাছাড়া আমাদের বর্ণনার একটা বড়ো একপেশেমি হল, আমরা শুধু শ্যামলীদির ইতিবাচক ধারাগুলি এঁকেছি। নেতিবাচক ধারাগুলি আমরা তেমন জানিও না, আর সেগুলিকে ধরার চেষ্টাও করিনি। আবার, ইতিবাচক ধারাগুলিকেও পালিশ করেছি আমাদের বোধ দিয়ে। তাহলে আমাদের ছবিকে বাস্তবের শ্যামলীদি কী করে বলবো?

আমি আমরিন ও কয়েকজন বন্ধু বহু বছর ধরে শ্যামলীদির প্রভাব গ্রহণ করেছি, এই নিয়ে অনেক আলাপ করেছি। এই সব করতে করতে শ্যামলীদির ধারাগুলো আমাদের ধারার সঙ্গে মিলেমিশে গেছে অনেকটাই। তাই ওনার ধারাগুলির বর্ণনা আমরা আমাদের ওই খিচুড়ি অনুভব দিয়েই করেছি। শ্যামলীদিতো ওঁর অনেক চিন্তা স্পষ্ট করে বলতেন না বা লিখতেন না। তাই ওঁর জীবন যাত্রার ভাষা আমরা পাঠ করেছি আমাদের বোধ দিয়ে। একে প্রামাণ্য তথ্য ভিত্তিক বলা যায়না। তারপর অনেক ঘটনা, কথা-বার্তার স্মৃতি খুব ঝাপসা হয়ে গেছে। সেগুলি আজকে নির্মাণ করতে গিয়ে নিশ্চয়ই আমরা 'আপন মনের মাধুরী' কম বেশি ব্যবহার করেছি। এতে অনেক ভুল, একপেশেমি, বিকৃতি নিশ্চয়ই থাকবে।

Scanned by CamScanner